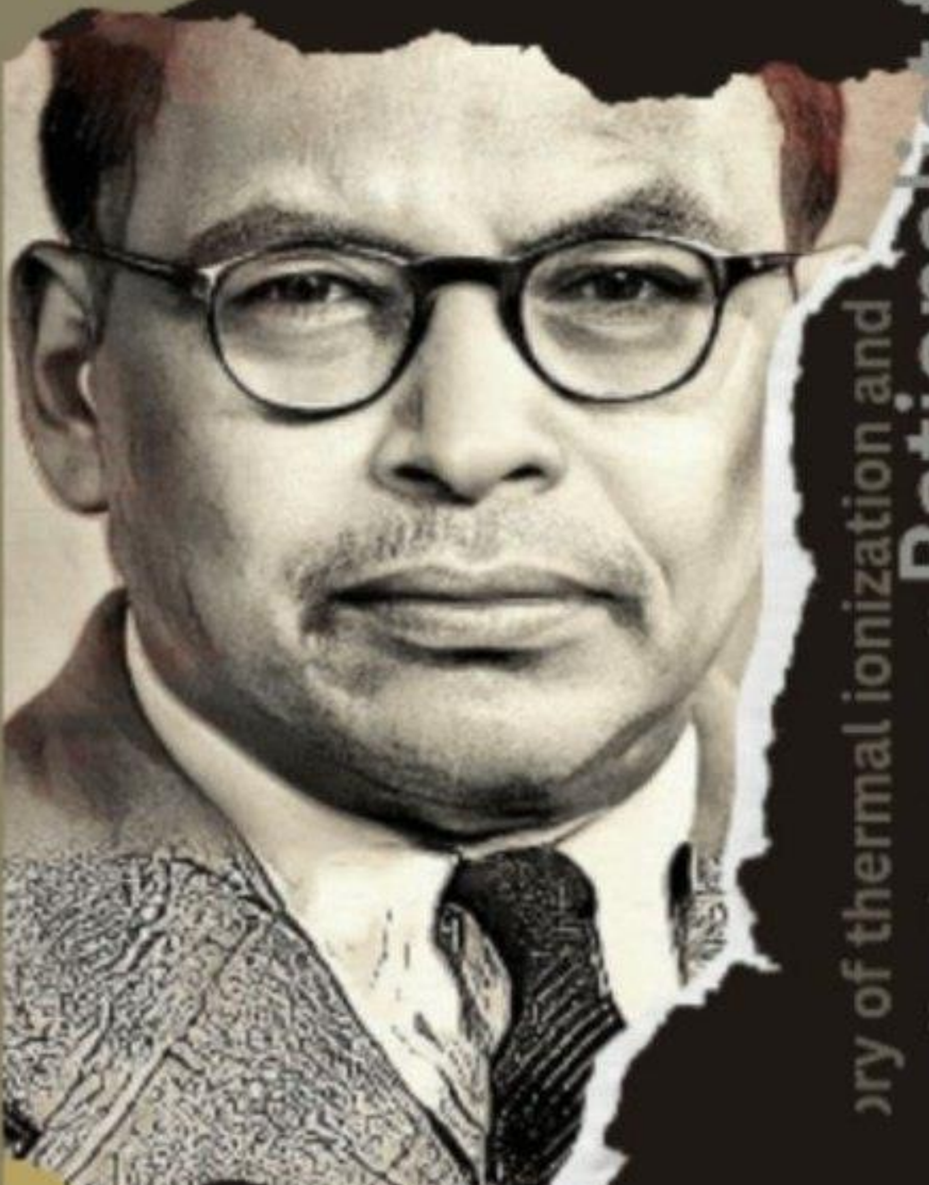
অক্টোবর সংখ্যা
২০২২

চেতনার অন্বেষণে

মুক্তচিন্তক সামযিকী



‘মেঘনাথ’ থেকে ‘মেঘনাদ’
পার্থ সারথি চন্দ্র

অচলায়তন
মহম্মদ মহসীন

উর্দু ভাষার ট্র্যাজেডি এবং হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ
অনুজ বিশ্বাস

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ২০২২
সরোজ নাগ

অন্ধদের হাতি দর্শনে হাতি গালগল্প?
মুজিব রহমান

বাইবেল ও কোরানে মহাবিশ্বের সৃষ্টি
শম্ভুনাথ চার্বাক

কুযুক্তি বহুল প্রচলিত কুযুক্তি বা হেত্বাভাস

নষ্ট ধর্ম
সজল কান্তি টিকাদার

বি শে ষ সং যো জ ন
আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম ‘সবই ব্যাদে আছে’
মেঘনাদ সাহা

যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

চেতনার অন্বেষণে

| মুক্তচিন্তক মাসিক পত্রিকা
| অক্টোবর সংখ্যা, ২০২২

সম্পাদক
যুক্তিবাদীরা

প্রকাশ সংখ্যা
বিশতম

সহায়তায়
অরিন্দম, পার্থপ্রতিম, সাগ্নিক,
সজল, শক্তি মন্ডল, লর্ড নিও
উপেন রায় ও কিনোক্ষ্যাপা

যোগাযোগ
yuktibadira@gmail.com
WhatsApp@9564556134
Telegram:@Yuktibadira
Website:rationalists
কলকাতা – ৫৬

বিনিময় মূল্য নাই

সূচি

প্রবন্ধ - নিবন্ধ:

কবিতা:

বি শে ষ সং যো জ ন

মুক্তচিন্তক সম্মাননা

মুক্তচিন্তা নিয়ে বিগত সংখ্যা অবধি যাঁরা পাঁচটি বা তার অধিক লেখা দিয়েছেন, তাঁদের সম্মানজ্ঞাপক একটি শংসাপত্র প্রদান করছি। **পাঁচটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রটি প্রদান করা হতে থাকবে আগামীতেও।**

যাঁদের দৃপ্ত লেখনীতে ‘চেতনার অন্বেষণে’র পাঠক ঋদ্ধ হয়ে চলেছে।

এমাসে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করছি

শম্ভুনাথ চার্বাক মহাশয়কে

তাঁর বলিষ্ঠ লেখার সাথে আমরা সবাই পরিচিত।

শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই

সমস্ত মুক্তমনা, যুক্তিবাদীদের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাই, আমরা গর্বিত, চেতনার অন্বেষণে’কে সমৃদ্ধ করেছেন।

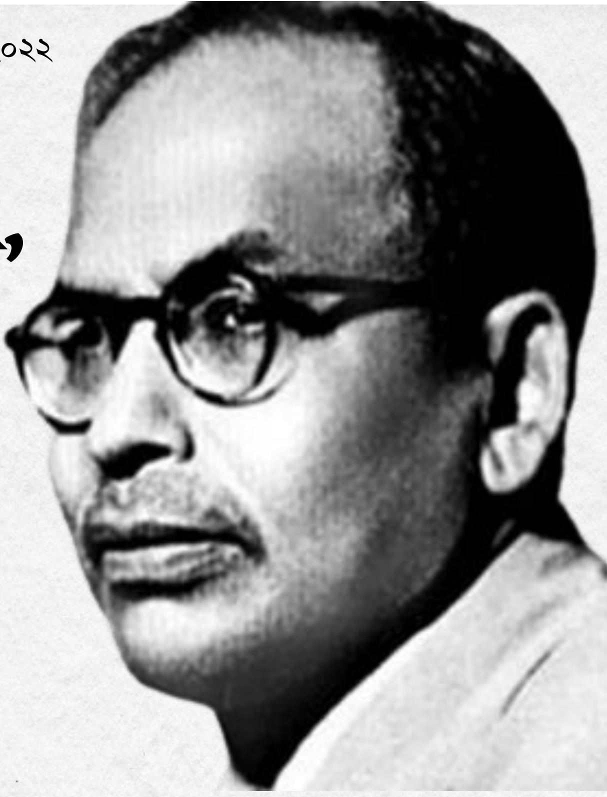
সম্পাদকীয়

এমাসেই এক নক্ষত্রকে হারালাম, প্রবাদপ্রতিম লেখক, মার্কসবাদী প্রাবন্ধিক, যুক্তিবাদী, মুক্তমনা রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রয়াত হলেন, তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। পরের সংখ্যার তাঁর কিছু প্রকাশ করবো। এই বিশিষ্ট মানুষটিকে নিয়ে স্মৃতিকথা লিখেছেন তাঁর এক সুযোগ্য ছাত্র, লেখাটি অবশ্যই পড়ে দেখুন। বরাবরের মতোই আপনাদের প্রেরণা ছাড়া এতকিছু করা সম্ভব হতো না। অশোক কুমার দাস মহাশয় সম্ভবত আমাদের সবচেয়ে বয়স্ক পাঠক, আশির কোঠায়, এখনও নিয়মিত মেইল করেন, অবশ্য পাঠক মাত্রই চিরতরুন। এবারে ম্যাগাজিনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেশকিছুজন এগিয়ে এসেছেন, আস্তে আস্তে তাদের সাথে পাঠকের পরিচয় হবে নিশ্চয়ই। কভারের ছবিটিও এক দূরের বন্ধুর করে দেওয়া। প্রুফ রিডিং এও সাহায্য পেয়েছি। তারচেয়ে বড় কথা সবাই ম্যাগাজিনের টিমে যুক্ত হয়েছে দেখে আপ্লুত হলাম। এই টিমটি ভবিষ্যতে আরও বড় কিছু করবে কামনা করি।

মুক্তমনাদের প্রয়োজনীয় এমন বইপত্রগুলিকে একত্রিত করা হয়েছে ‘চেতনা’ টেলিগ্রাম চ্যানেলে। **প্রায় দুই হাজার বইপত্র আছে। বইগুলিকে ক্যাটালগও করে দেওয়া হয়েছে।** যাঁরা বইগুলি পড়তে চান নিচে লিংক দেওয়া থাকবে সহজেই পড়তে পারবেন।

ম্যাগাজিন কেমন লাগছে জানাতে একেবারেই ভুলবেন না। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আরও লিখুন, পড়ুন ও মানুষের পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।

‘মেঘনাথ’ থেকে ‘মেঘনাদ’



- পা র্থ সা র থি চ ন্দ্র

হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির প্রতি বিদ্বেষে নিজের নাম বদলে ফেলেছিলেন মেঘনাদ সাহা।

আজ ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার পথিকৃত মেঘনাদ সাহার ১২৯ তম জন্ম বার্ষিকী। তিনি গণিত নিয়ে পড়াশোনা করলেও পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়েও গবেষণা করেছেন। তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে ‘তাপীয় আয়নীকরণ তত্ত্ব’ প্রতিষ্ঠাতা করেন। তার আবিস্কৃত ‘সাহা আয়নীভবন সমীকরণ’ নক্ষত্রের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মগুলো ব্যাখ্যা করতে অপরিহার্য।

শুধু ভারতীয় উপমহাদেশে নয় - সমগ্র বিজ্ঞানের জগতে আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে উঠেছে যে ক’জন মানুষের মৌলিক তত্ত্বের ওপর - অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তাঁদের অন্যতম।

১৯২০ সালে মেঘনাদ সাহার 'তাপীয় আয়নায়নের সমীকরণ' (আয়নাইজেশান ইকুয়েশান) প্রকাশিত হবার পর থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে যত গবেষণা হয়েছে তাদের প্রায় সবগুলোই সাহার সমীকরণ দ্বারা প্রভাবিত। নরওয়ের বিখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী সেভিন রোজল্যান্ড অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত 'থিওরেটিক্যাল এস্ট্রোফিজিক্স' বইতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এ'কথা। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের পারমাণবিক তত্ত্ব থেকে শুরু করে বিগ-ব্যাং তত্ত্বের পরীক্ষণ পর্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে যে যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে - সেই সাইক্লোট্রনের উদ্ভাবক নোবেল বিজয়ী আর্নেস্ট লরেন্স সহ অসংখ্য বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছেন মেঘনাদ সাহা তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে। নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী আর্নল্ড সামারফেল্ড, নীল্‌স বোর, ম্যাক্স বর্ন, আলবার্ট আইনস্টাইন, আর্থার এডিংটন, এনরিকো ফার্মি, আর্থার কম্পটন প্রমুখ দিকপাল মুগ্ধতার সাথে স্বীকার করেছেন মেঘনাদ সাহার অনন্য প্রতিভার কথা। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানচর্চার সাথে বিশ্বের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়ার ব্যাপারে এবং ভারতের বিজ্ঞান-গবেষণাকে বিশ্বমানে উন্নীত করার ব্যাপারে মেঘনাদ সাহার অবদান অনস্বীকার্য।

গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ পাবার পাশাপাশি মেঘনাদ সাহা নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন চার বার। ভারতীয় উপমহাদেশে

বিশ্বমাপের বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে মেঘনাদ সাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে। দেশে নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান পড়ানো শুরু হয়েছে মেঘনাদ সাহার হাতে। নিরলস চেষ্টা ও পরিশ্রমে গড়ে তুলেছেন ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স, ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি, ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশান - সবগুলো সংগঠনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে। বাংলাদেশ ও ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের প্রায় সবাই মেঘনাদ সাহার 'টেক্সট বুক অব হিট' বইটা পড়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মেঘনাদ সাহা মূলত পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। তিনি বিএসসি ও এমএসসি পাশ করেছেন মিশ্র গণিতে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় পদার্থবিজ্ঞান শুধু শিখেছেন তাই নয় - ক্রমশঃ পৌঁছে গেছেন এই বিষয়ের শিখরে।

উপমহাদেশে প্রথম সাইক্লোট্রন স্থাপিত হয় মেঘনাদ সাহার প্রচেষ্টায়। অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার পরও থেমে থাকেননি তিনি।

সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিজ্ঞানকে

সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে গেছেন তিনি। দরিদ্র অশিক্ষিত মা-বাবার সন্তান হয়েও মেধা, পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জোরে একজন মানুষ যে কত বড় হয়ে উঠতে পারেন মেঘনাদ সাহা তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর, সে-বছরও পাঁজিতে ছিল অক্টোবরের আকাশ জুড়ে মেঘ, ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস। এই ৬ অক্টোবর ঢাকার বংশাই নদীর ধারে শ্যাওড়াতলি গ্রামে জগন্নাথ সাহার স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হল। জগন্নাথ সাহা মুদির দোকানি ও হাঁটুরে ব্যবসায়ী, অবস্থা তেমন সচ্ছল নয়। তবুও কিন্তু এই প্রথম তাঁর সন্তান হচ্ছে না, এর আগে স্ত্রী ভুবনেশ্বরী দুই ছেলে, দুই মেয়ের জন্ম দিয়েছেন। এদিন প্রসববেদনা উঠতেই গ্রামের ধাই এসে হাজির, সেকালে বসতঘরের বাইরে আলাদা করে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য আঁতুড়ঘর তৈরি করা হতো, তো, সেই ঘরে ভুবনেশ্বরীকে আনা হল। আর তখনই আকাশ উথালপাথাল করে বজ্রবিদ্যুৎ গায়ে মেখে শুরু হল ঝড়। ঝড়ের দাপটে উড়ে গেল আঁতুড়ঘরের খড়ের চাল। সেই বজ্রনির্ঘোষ ঘনঘটার মধ্যেই জন্ম হল ভারতের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার। ঝড়-বাদলা-মেঘ নিয়ে জন্ম হয়েছিল বলে ঠাকুমা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'মেঘনাথ'। কিন্তু পরে স্কুলের খাতায় তাঁর এই নাম ঠিক করে রাখা হয় 'মেঘনাদ'। পরবর্তীকালে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাঁর প্রিয় হয়ে উঠেছিল,

আর সব চেয়ে প্রিয় হয়ে উঠেছিল নায়ক ‘মেঘনাদ’। এই প্রিয় হয়ে ওঠাটা শুধু নামের মিলের জন্য নয়, নায়ক মেঘনাদের জেদ, অনমনীয়তা ও বীরত্বের জন্য।

বাবার কোন ইচ্ছেই ছিল না, বলা ভালো জীবনে যে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা প্রয়োজন আছে এমন কোন ভাবনাই ছিল না জগন্নাথের। মুদির ছেলে মুদি হবে, তিনি বুড়ো হলে ছেলেরা তাঁর মতো ব্যবসা সামলাবে, এটাই তো ভবিতব্য, এর আর ভাবাভাবির কী আছে! কাজেই বড়ছেলে জয়নাথের মেট্রিকের গণ্ডি আর পেরনো হল না। ঢাকায় ছুটতে হল ব্যবসায়ীর গদিতে ব্যবসার কাজ শিখতে আর খিদমত খাটতে। মেঘনাদের কপালে এই ভবিতব্যই নাচছিল। পরিবেশে, পরিবারে কোথাও পড়াশোনার আবহাওয়া ছিল না, উৎসাহ দেওয়ারও কেউ ছিল না, তবু পড়ুয়ার স্বভাব নিয়ে কেমন করে যেন জন্ম নিয়েছিলেন মেঘনাদ। পড়তে না পেলে তিনি কান্নাকাটি শুরু করে দিতেন। পড়ার জন্য খুব ভোরে উঠতেন। এসময় ভোররাত্তিরে জোরে জোরে পড়তে গিয়ে বাবার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় মারও খেয়েছেন অনেকবার। তবুও, পড়াশোনা থেকে কেউ তাঁর মুখ ফেরাতে পারেনি। এই রকম একটি পরিবেশ থেকেই শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছেশক্তির প্রবলতায় উঠে এসেছিলেন, বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়েছিলেন মেঘনাদ সাহা।

বাবা জগন্নাথ সাহা ও মা ভুবনেশ্বরী দেবীর পঞ্চম সন্তান ছিলেন মেঘনাদ। জগন্নাথ সাহা ছিলেন একজন মুদি। ছোটবেলা থেকেই তাই রীতিমতো আর্থিক অনটেনর মধ্যে তাকে মানুষ হতে হয়েছিল। গ্রামের টোলে মেঘনাদের পড়ালেখার সূচনা হয়। গ্রামটিতে তৃতীয় শ্রেণির উপরে পড়ালেখার কোনও সুযোগ ছিল না। কিন্তু মেঘনাদের ইতিহাস আর গণিতের সাফল্যে তার শিক্ষকেরা তাকে একটি ইংরেজি স্কুলে পাঠানোর সুপারিশ করেন এবং গ্রামের মানুষের সহায়তায় তা সফল হয়।

ছোটবেলায় গ্রামের সরস্বতী পুজোয় তিনি দেবীর কাছাকাছি চলে গিয়ে ছুঁয়ে ফেলার অপরাধে এক নির্বোধ গোঁড়া পুরুতের কাছে চরম অপমানিত হয়েছিলেন।

নিম্নজাতের ধুয়ো তুলে তাঁকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে সমস্ত দেবদেবীর পুজোর ওপর তিনি শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন, এমনকি বিদ্যার দেবীর ওপরেও, কিন্তু বিদ্যার ওপরে নয়।

কিন্তু এক বার সরস্বতী পুজোর দিন বদলে গিয়েছিল সব কিছু। পুজোমণ্ডপে অঞ্জলি দেওয়ায় মেঘনাদের উপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল ব্রাহ্মণ ছাত্ররা। ব্যাপারটা এ রকম যে, তুমি যতই মেধাবৃত্তি পাও, আসলে তো ছোট

জাত। তাই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এক আসনে বসার যোগ্যতা অর্জন করতে পারো না। মেঘনাদের ব্রাহ্মণ সহপাঠীদের ভাবগতিক এমনই ছিল। এই ঘটনাই জাতিভেদের বিরূদ্ধে আজীবন লড়াই করার বারুদ ভরে দিয়েছিল মেঘনাদের বুকে, যার ছাপ পড়েছিল তাঁর বিজ্ঞান গবেষণা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মতাদর্শে।

সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছিল বৈদিক ধর্মের প্রথা, প্রতিষ্ঠান এবং সেগুলিকে ব্যবহার করে হাজার হাজার বছর ধরে চলতে থাকা সামাজিক বিভেদের প্রতি বিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষ এমনই জায়গায় পৌঁছেছিল যে তিনি পিতৃদত্ত নাম পর্যন্ত বদলে নিয়েছিলেন।

১৯৯০ সালের ১৪ জানুয়ারি, স্মিথসোনিয়ান ন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামের কিউরেটর ডেভিড ডিভরকিনকে লেখা এক চিঠিতে মেঘনাদ সাহার বড় ছেলে অজিত সাহা জানিয়েছিলেন, যে দিন তাঁর বাবা জন্মেছিলেন, সারা দিন ধরেই প্রচণ্ড ঝড়-জলের তাণ্ডব। আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী ঝড়-জলের দেবতা দেবরাজ মেঘরাজ ইন্দ্র। তাই দেবরাজ ইন্দ্রের নামানুসারে নবাগত শিশুর নাম রাখা হয়েছিল মেঘনাথ। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের বৈদিক ধর্মীয় আচরণের গোঁড়ামি

মেঘনাথকে এতটাই বিরক্ত করে তুলেছিল যে, তিনি নিজের নাম পাল্টে রেখেছিলেন মেঘনাদ। যিনি ইন্দ্রজিৎ। দেবতা নন, রাক্ষসদের প্রতিনিধি। সেই থেকে গোটা বিশ্বের কাছে তিনি মেঘনাথ নন, মেঘনাদ নামে পরিচিত হন। তাঁর চোখে মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ সমাজের অপমানিত অংশের প্রতিনিধি, যাঁকে অন্যায় ভাবে বধ করেছিল ব্রাহ্মণ সমর্থিত এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র। শুধু বিজ্ঞান বা রাজনৈতিক মতাদর্শ নয়, নিজের নাম বদলেও মেঘনাদ প্রমাণ করেছিলেন তিনি আসলে ডেমোক্র্যাটিক ক্লাসের প্রতিনিধি, যাদের পিছিয়ে পড়া বলা হয়, জোর করে পিছিয়ে রাখা হয়।

তিনি নাস্তিক হলেও, সেই নাস্তিকতা শুধুই অপমান থেকে আসেনি, এসেছিল জ্ঞান থেকে। তিনি সমস্ত ধর্মের বই আত্মস্থ করে তারপর বিজ্ঞানের স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হয়েছেন, ধর্মের পরস্পরবিরোধী দর্শন নিয়ে নয়।

তাই আমাদের দীর্ঘদিনের পঞ্জিকার অনুমানমূলক জ্যোতিষগণনার পরিবর্তে তাতে জ্যোতির্বিদ্যার প্রবেশ ঘটিয়ে পঞ্জিকা সংস্কার করেন। বিশ্ববিজ্ঞানের সব কিছুই বেদে আছে, এই কথা যে বেদবাদীরা বলেন, তাঁদের বিরোধীতা করায় চরম প্রতিবাদের মুখে পড়েন মেঘনাদ,

কিন্তু তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, বিজ্ঞান আর দর্শন কখনই এক নয়, হতে পারে না। মাইকেলের কাব্যের নায়ক মেঘনাদের মতই কোনদিনই কোন চাপের কাছে, কোন বিরুদ্ধতার কাছে মাথা নত করেননি তিনি।

এরপর তিনি প্রাথমিক পরীক্ষায় তৎকালীন ঢাকা জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায়। সে সময় মাসিক 8 টাকার সরকারি বৃত্তি পান, বৃত্তির টাকা ও জয়নাথের পাঠানো পাঁচ টাকা নিয়ে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তির উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসেন এবং ভর্তি হন। এরপর বৈশ্য সমিতির মাসিক দুই টাকা বৃত্তিও তিনি লাভ করেন।

এদিকে সেই সময় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলছিল। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পূর্ব বাংলার গভর্নর স্যার বামফিল্ড ফুলার আসবেন শুনে বিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী তার সম্মুখে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী মিছিল করবে নির্ধারণ করে। সে মিছিলে মেঘনাদও যোগ দেন। ফলে পরদিন তাকে স্বদেশী আন্দোলন এ জড়িত থাকার জন্য ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ছাড়তে বাধ্য করা হয়। পাশাপাশি তার সরকারী বৃত্তিও বাতিল করা হয়।

পার্শ্ববর্তী কিশোরীলাল জুবিলি হাই স্কুলের একজন শিক্ষক স্বঃপ্রণোদিত হয়ে মেঘনাদকে তাদের স্কুলে ভর্তি

বিনাবেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন।

সহপাঠি হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও উপরের শ্রেণির প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ, আচার্য হিসেবে জগদীশ চন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সান্নিধ্য লাভ করেন।



১৯১৩ সালে গণিতে সম্মানসহ বিএসসি করেন এবং ১৯১৫ সালে ফলিত গণিতে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রথম হন।

মেঘনাদ তার সমস্ত গবেষণা ফলাফল গুলো একত্র করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডক্টর অব সায়েন্স' ডিগ্রির জন্য আবেদন করেন। তার সব গবেষণা বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ১৯১৯ সালে 'ডক্টর অব

সায়েন্স' ডিগ্রি প্রদান করে। একইবছর মেঘনাদ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। যার ফলে তিনি ইংল্যান্ড ও জার্মানীতে গবেষণার সুযোগ পান।

১৯১৬ সালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান কলেজ চালু করার পর সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ উভয়েই গণিত বিভাগের যোগ দিতে বলেন দেন। যদিও পরবর্তী কালে দুজনেই পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে চলে যান। সেখানে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন পালিত অধ্যাপক হিসেবে পরবর্তীতে যোগ দেন। এরপর ১৯১৯ সালে তিনি প্রথম পাঁচ মাস লণ্ডনে বিজ্ঞানী আলফ্রেড ফাউলারের পরীক্ষাগারে এবং পরবর্তীতে বার্লিনে ওয়াস্টার নার্নস্টের সাথে কাজ করেন। দুইবছর ধরে দেশের বাইরে গবেষণা করার পর মেঘমাদ সাহা ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খয়রা অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য কোনো বরাদ্দ সেসময় না থাকায় তিনি ১৯২৩ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। তিনি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গণিতবিদ অমিয় চরন ব্যানার্জি এর সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৫ বছর ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি বিভাগটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেন। এরপর তিনি মারা যাবার আগে অব্দি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর বিজ্ঞান বিভাগের ডিন হিসেবে দ্বায়িত্বপালন করেছেন।

১৯১৭ সাল। ব্রিটিশশাসিত ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড চেম্সফোর্ড কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন স্থাপন করলেন। কমিশনের প্রধান হিসেবে বসানো হল এম ই স্যাডলারকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন কেমন চলছে তার রিপোর্ট তৈরি করাই স্যাডলারের দায়িত্ব। যদিও কমিশনের আসল উদ্দেশ্য অন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরমহলে নজর রাখা। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের পর থেকেই কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্রিটিশ সরকারের চোখে বিপ্লবী তৈরির আখড়া। স্যাডলার একটা প্রশ্নপত্র তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী মিলিয়ে মোট ৬৭১ জনকে বিলি করেন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে আরও দাবিদাওয়া আলাদা করে লিখে জানানো যাবে। স্যাডলার জানতেন, উত্তরপত্রে কড়া নজর থাকবে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের।

উত্তরদাতাদের মধ্যে একজনের উত্তরপত্র ছিল বেশ দীর্ঘ। পঠনপাঠনের সমস্যা ছাড়াও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্যময় পরিবেশের দিকেও আঙুল তুলেছিলেন। উত্তরপত্রে লেখা ছিল, “যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে আবাসিক করে তোলার কথা ভাবা হয় এবং যথাযথ হস্টেলের ব্যবস্থা করা হয় তা হলে ‘ডেমোক্র্যাটিক ক্লাস’ বা গণতান্ত্রিক শ্রেণির (আমি তাদেরই গণতান্ত্রিক শ্রেণি বলে অভিহিত করছি, যাদের পিছিয়ে পড়া

শ্রেণি বলা হয়) কথা ভাবতেই হবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যে লাগোয়া হস্টেল রয়েছে, তাতে তথাকথিত উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণদের মৌরসিপাট্টা চলছে। সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে কায়স্থ ও বৈদ্য ছাত্রেরা। কোনও গণতান্ত্রিক শ্রেণির ছাত্রকেই ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ ছাত্র এক ঘরে মেনে নেয় না বা একসঙ্গে খেতে বসলেও আপত্তি জানানো হয়।” উত্তরদাতা বছর কুড়ির এক লেকচারার মেঘনাদ সাহা। মাত্র দু’বছর আগে স্নাতকোত্তর পাশ করেছেন এবং স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে এসেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টে মেঘনাদ সাহার মতোই পিছিয়ে পড়া বা ‘নিচু জাত’-এর ছাত্রদের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। কিন্তু তাঁর ও মেঘনাদের দৃষ্টিভঙ্গির বুনিয়াদি পার্থক্য ছিল, যা বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর রিপোর্টে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের জন্য আলাদা আর্থিক তহবিল গড়ার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন।

শীলের রিপোর্টে যুগ্নি, বারিক, সুবর্ণবণিক, নমঃশূদ্র, সাহাদের ‘ডিপ্রেসড ক্লাস’ বা

কোথাও ‘লোয়ার কাস্ট’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সেখানে মেঘনাদের রিপোর্টে এরা প্রত্যেকেই এক ছাতার তলায়, গণতান্ত্রিক শ্রেণি। নিজের রিপোর্টে পৃথক তহবিল গড়ে তোলাকে একদমই প্রশ্রয় দেননি মেঘনাদ। তিনি সবার সমান অধিকারের প৩ক্ষে। মেঘনাদের দৃষ্টিভঙ্গি দেশের বর্তমান ভর্তুকিপুষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার সরাসরি বিপক্ষে। তিনি সেই সময়েই বুঝেছিলেন, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের বিভেদ টেনে এবং ভর্তুকি দিয়ে কোনও এক বিশেষ শ্রেণির উন্নতির সম্ভাবনাকে মেরে ফেলায় দেশের সত্যিকারের উন্নতি সম্ভব নয়।

২৮ বছর পরে, দেশভাগের সময়েও মেঘনাদ সাহার গলায় ধ্বনিত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টেরই সুর। তখন তিনি আর ২০ বছরের লেকচারার নন। প্রথিতযশা বিজ্ঞানী। কিন্তু ল্যাবরেটরির বাইরে এসেও তিনি শুনিয়েছিলেন তাঁর সাম্যের গান। স্বাধীনতার বছর দুই আগে সায়েন্স অ্যান্ড কালচার পত্রিকায় মেঘনাদ লেখেন, “দেশভাগের ফলে ভারতে থাকা মুসলমানরা হিন্দুরাজের পদদলিত হয়ে থাকবে এবং সংখ্যালঘু শ্রেণিতে পরিণত হবে বলেই মনে হয়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকেও একটা কড়া জাতীয়তাবাদের রেখা দিয়ে ভাগ করে দেওয়া হবে, যা সংখ্যালঘু শ্রেণির মধ্যে ডেকে আনবে

সীমাহীন দারিদ্র্য।” পরের বছর ফের একই পত্রিকায় লেখেন,

“সত্যিকারের স্বাধীনতা পেতে হলে, অশিক্ষা থেকে মুক্তি পেতে হলে, রোগ-জরা-ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে হলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে যেতে হবে।”

‘আওয়ার ন্যাশনাল ক্রাইসিস’ শিরোনামের সেই প্রবন্ধে মেঘনাদের মূল বক্তব্য ছিল, সবাইকে কর্মযজ্ঞে শামিল করতে হবে, তা না হলে প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না।

মেঘনাদ এবং সত্যেন বোস যুগ্মভাবে সর্বপ্রথম আলবার্ট আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সহ তার বিভিন্ন নিবন্ধ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। আইনস্টাইনের ১৯০৫ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত মোট যতগুলি নিবন্ধ জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল তার সবগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ শুরু করেন মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তাদের এই অনুবাদ ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'প্রিন্সিপাল্‌স অব রিলেটিভিটি' নামে প্রকাশিত হয়। অনূদিত বইটির ভূমিকা লেখেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। ১৯৭৯ সালে আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বলা হয় আইনস্টাইনের নিবন্ধগুলির প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল জাপানে।

এই ভুল সংশোধন করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখরের চেষ্টায় আইনস্টাইনের রচনার প্রথম অনুবাদের স্বীকৃতি পান সাহা ও বসু। তাদের এই অনূদিত প্রিন্সিপাল্‌স অব রিলেটিভিটির একটি প্রতিলিপি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনস্টাইন আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে। সাহা ও বসুর এই অনুবাদ সর্বপ্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ শুধু নয়, সারাবিশ্বে এটিই আইনস্টাইনের রচনার প্রথম অনুবাদ।

১৯৩০ সালে ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী দেবেন্দ্র মোহন বসু এবং শিশির কুমার মিত্র মেঘনাদ সাহাকে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন।

নোবেল কমিটি মেঘনাদ সাহার কাজকে পদার্থবিজ্ঞানের একটি উল্ল্যেখযোগ্য প্রয়োগ হিসেবে বিবেচনা করলেও এটি "আবিষ্কার" নয় বলে তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি।

মেঘনাদ সাহাকে ১৯৩৭ সালে এবং ১৯৪০ সালে আর্থার কম্পটন এবং ১৯৩৯, ১৯৫১ ও ১৯৫৫ সালে শিশির কুমার মিত্র আবারও মনোনীত করলেও নোবেল কমিটি তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে।

তিনি ভারতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে আধুনিক গবেষণার জন্য ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গে সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার

ফিজিক্স প্রতিষ্ঠা করেন। পদার্থবিজ্ঞানে তার অবদানের জন্য ১৯২৭ সালে লন্ডনের রয়াল সোসাইটি তাকে এফআরএস নির্বাচিত করে।



তিনি গণিত নিয়ে পড়াশোনা করলেও পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়েও গবেষণা করেছেন। তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে 'তাপীয় আয়নীকরণ তত্ত্ব' প্রতিষ্ঠাতা করেন। তার আবিস্কৃত 'সাহা আয়নীভবন সমীকরণ' নক্ষত্রের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মগুলো ব্যাখ্যা করতে অপরিহার্য।

তিনি ও তার সহপাঠী এবং সহকর্মী সত্যেন্দ্রনাথ বসু সর্বপ্রথম আইনস্টাইনের 'স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি' জার্মান থেকে ইংরাজি অনুবাদ করেন যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া ভারতের নদী নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ভারতে পদার্থবিদ্যার বিকাশ ও প্রসারের

জন্য ১৯৩১ সালে 'ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স, ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও ১৯৩৪ সালে ভারতে পদার্থবিজ্ঞানীদের সংগঠন 'ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি'ও প্রতিষ্ঠা করেন। তার উদ্যোগেই ভারতে 'ইন্ডিয়ান ইন্সটিউট অব সায়েন্স' এর সূচনা হয়, যা বর্তমানে 'ইন্ডিয়ান ইন্সটিউট অব টেকনোলজি' (আই. আই. টি.) নামে বর্তমানে পরিচিত।

১৯৫২ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী রূপে ভারতীয় লোকসভার কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্র (বর্তমানে কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্র) হতে নির্বাচিত সাংসদ হন।

কিন্তু কেমন ছিলেন ব্যক্তি মেঘনাদ? তাঁর ছাত্র ব্রজেন্দ্রকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা থেকে জানা যায়, স্পষ্টবক্তা হিসেবে ‘কুখ্যাতি’ ছিল মেঘনাদের। আসলে কাজের জায়গায় কোনও রকম কুঁড়েমি তিনি পছন্দ করতেন না। ছাত্ররা তাঁকে ভয় পেত।

কিন্তু কড়া শিক্ষকের ভিতরে লুকিয়ে ছিল এক ছাত্রদরদি নরম মনের মানুষ।

ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়,

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন কলকাতায় জাপানি বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে, অধ্যাপক সাহার সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকতে শুরু করেছিলেন তিনি। সকালে চা খেয়ে

পড়াশোনা, গবেষণার কাজ শুরু করায় অভ্যস্ত ছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। কিন্তু অধ্যাপক সাহার বাড়ির রান্নার লোক অনেকটাই দেরি করে আসতেন। ছাত্রের অসুবিধের কথা ভেবে নিজে হাতে চা তৈরি করে খাওয়াতেন তিনি। তবে হঠাৎ করে রেগে যাওয়াও ছিল মেঘনাদের স্বভাবের একটি অঙ্গ। আসলে, অসম্ভব প্রতিভার অধিকারী মানুষটি সারা জীবনই বঞ্চনা ও গঞ্জনার শিকার - যা প্রভাব ফেলেছিল তাঁর স্বভাবেও। এমনকি নিজের বিবাহেও সহ্য করতে হয়েছিল গঞ্জনা।

মেঘনাদ সাহার বউমা বিশ্ববাণী সাহার লেখা থেকে জানা যায়, ১৯১৮ সালে রাধারাণী রায়ের সঙ্গে বিবাহ হয় মেঘনাদের। বিয়েতে তাঁর পাঞ্জাবির তলা দিয়ে ছেঁড়া গেঞ্জি দেখা যাচ্ছিল। পাত্রের দুর্দশা দেখে বিয়েতে প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছিলেন রাধারাণীর ঠাকুমা। আসলে গবেষণায় মগ্ন মানুষটি তখনও জীবনে বিশেষ টাকাকড়ি করে উঠতে পারেননি। কিন্তু তা বলে বিদ্যাচর্চায় খামতি থাকেনি। গবেষণাগার থেকে ফিরেও বইয়ের জগতে ডুবে যেতেই পছন্দ করতেন। বাড়িতে ছিল নিজস্ব লাইব্রেরি। রবীন্দ্রনাথ ও শেক্সপিয়রের ভক্ত ছিলেন।

মেঘনাদ সাহার তৃতীয় কন্যা চিত্রা রায় জানিয়েছেন, অধ্যাপক সাহা যখন গবেষণার কাজ সেরে বাড়িতে ফিরতেন, শেক্সপিয়রের ‘কমেডি অব এররস’ থেকে পড়ে

শোনাতে হত তাঁকে। অধ্যাপক সাহার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে জায়গা পেয়েছিল বিশ্বসাহিত্যের বিশাল সম্ভার - যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ম্যাক্সিম গোর্কি, নুট হামসুন, লিয়ো টলস্টয়ের লেখা বইপত্র। অধ্যাপক সাহার এই সাহিত্যপ্রেম দানা বেঁধেছিল ইলাহাবাদে থাকাকালীন। ইলাহাবাদে সেই সময়ে একটা বাংলা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যার মধ্যমণি ছিলেন প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়াও ছিলেন যোগেনচন্দ্র গুপ্ত। এঁদের সান্নিধ্য অধ্যাপক সাহার কাছে ছিল বিজ্ঞান ও রাজনীতির বাইরে এক ঝলক মুক্ত বাতাসের মতো। সাহিত্য পাঠ ও চর্চা ছাড়াও দেশবিদেশের পত্রিকা সংগ্রহে তাঁর উৎসাহ ছিল। বাড়ির ছোটদের ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক ম্যাগাজিন থেকে বিভিন্ন ছবি দেখাতেন, অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি পড়ে শোনাতেন। ছোটদের জন্য কলমও ধরেছিলেন কয়েক বার, যা প্রকাশিত হয় যোগেনচন্দ্র গুপ্তের 'শিশুভারতী' পত্রিকায়। সাহিত্য ছাড়াও অধ্যাপক সাহা উৎসাহী ছিলেন ভাষাতত্ত্ব চর্চায়। বিদেশি ভাষা শেখার প্রতি তাঁর আকর্ষণের সূত্রপাত ঢাকার স্কুল থেকে। ছাত্রাবস্থায় ঢাকা ব্যাপটিস্ট মিশন আয়োজিত এক পরীক্ষায় তিনি সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন। ইন্টারমিডিয়েটে জার্মান ভাষার সঙ্গে পরিচয়। এর পরে সারা জীবনই যখন সুযোগ পেয়েছেন বিভিন্ন ভাষা চর্চা করে গিয়েছেন। রমাপ্রসাদ চন্দ্র, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিরজা শঙ্কর গুহর সঙ্গে বিভিন্ন

সংস্কৃতির ভাষা চর্চা করতেন নিয়মিত। সেই বিষয়ে একাধিক বই সংগ্রহ করাটাও তাঁর নেশা ছিল।

‘দেশ’ পত্রিকাকে (১৯৯৩, ৯ অক্টোবর সংখ্যা) দেওয়া সাক্ষাৎকারে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পণ্ডিত ডেভিড ডিভরকিন জানিয়েছিলেন, মেঘনাদ সাহাকে পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ়ের জন্য মনোনীত করার চেষ্টা করেছিলেন ১৯২৭-এর পদার্থবিদ্যায় নোবেলজয়ী আর্থার কম্পটন। কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণায় ভাটা পড়ার কারণেই হোক বা দেশীয় বিজ্ঞানীদের বিরোধিতায়, নোবেল প্রাইজ় তিনি পাননি। তাঁর জীবনযাপনের দিকে চোখ রাখলে বোঝা যায়, নোবেল পুরস্কারের মুখাপেক্ষীও ছিলেন না তিনি। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ছিল বিজ্ঞানের হাত ধরে জাতিভেদ, অসাম্যকে জয় করা এবং তথাকথিত উঁচু তলার মানুষদের তৈরি করা বিভাজন রেখাকে মুছে ফেলা। আমৃত্যু সেই কাজটাই করে গিয়েছেন মেঘনাদ নিষ্ঠার সঙ্গে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিজ্ঞান সংগঠক মেঘনাদকে না পেলে ভারত বিজ্ঞান গবেষণায় সাবালক হয়ে উঠত না।

কংগ্রেসের চরকা কাটার নীতির বিরোধিতার কারণে দেশের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল ছিল না, যা বাধা সৃষ্টি করেছিল মেঘনাদ সাহার কর্মকাণ্ডে। স্বাধীনতার পরে, ভারত

সরকারের পারমাণবিক শক্তি কমিশনেও তাঁর মতামত অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংগঠক হিসেবে নিজের কাজ করে গিয়েছেন তিনি। এশিয়া মহাদেশের প্রথম সাইক্লোট্রন যন্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করা, প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈরিও তাঁর সাহসী পদক্ষেপের পরিচয় বহন করে। এ ছাড়াও দেশীয় উপাদানে নিজের বিটা স্পেকট্রোমিটারও তৈরি করেছিলেন অধ্যাপক সাহা, যার সাহায্যে ভারতীয় খনিজ পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা জরিপ করা, এ দেশে জীববিজ্ঞানের গবেষণাকেন্দ্রিক বিজ্ঞান বা নিউক্লিয়ার সায়েন্সের প্রয়োগ তাঁর হাত ধরেই শুরু হয়।

১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আচমকাই মৃত্যু এসে থামিয়ে দিয়েছিল এই বিশাল কর্মযজ্ঞ। ছাত্র ব্রজেন্দ্রকিশোরের লেখায় আছে, 'ড. জ্ঞান ঘোষের ফোনে অধ্যাপক সাহার



অসুস্থতার খবর পাই। ওয়েলিংটন নার্সিংহোমে পৌঁছে জানতে পারি সব শেষ।'

বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত সাফল্যের ঊর্ধ্বে মেঘনাদ স্থান দিয়েছিলেন দেশকে, জাতিকে, দেশের অর্থনীতিকে। কিন্তু তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি ছিল, তিনি সময়ের আগে জন্মেছিলেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত হয়ে উঠতেই পারেনি তৎকালীন ভারত। তাই বিজ্ঞান বা রাজনীতি, সব ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিষ্ঠানবিরোধী। একটা বিষয় লক্ষ করার মতো, ভারতীয় বিজ্ঞানের তিন নক্ষত্র প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আচার্য হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু মেঘনাদ সাহা আজও শুধুই অধ্যাপক সাহা। এ ক্ষেত্রেও তিনি ডেমোক্র্যাটিক ক্লাসের প্রতিনিধি, যাদের 'পিছিয়ে পড়া' বলা হয়, জোর করে পিছিয়ে রাখা হয়।

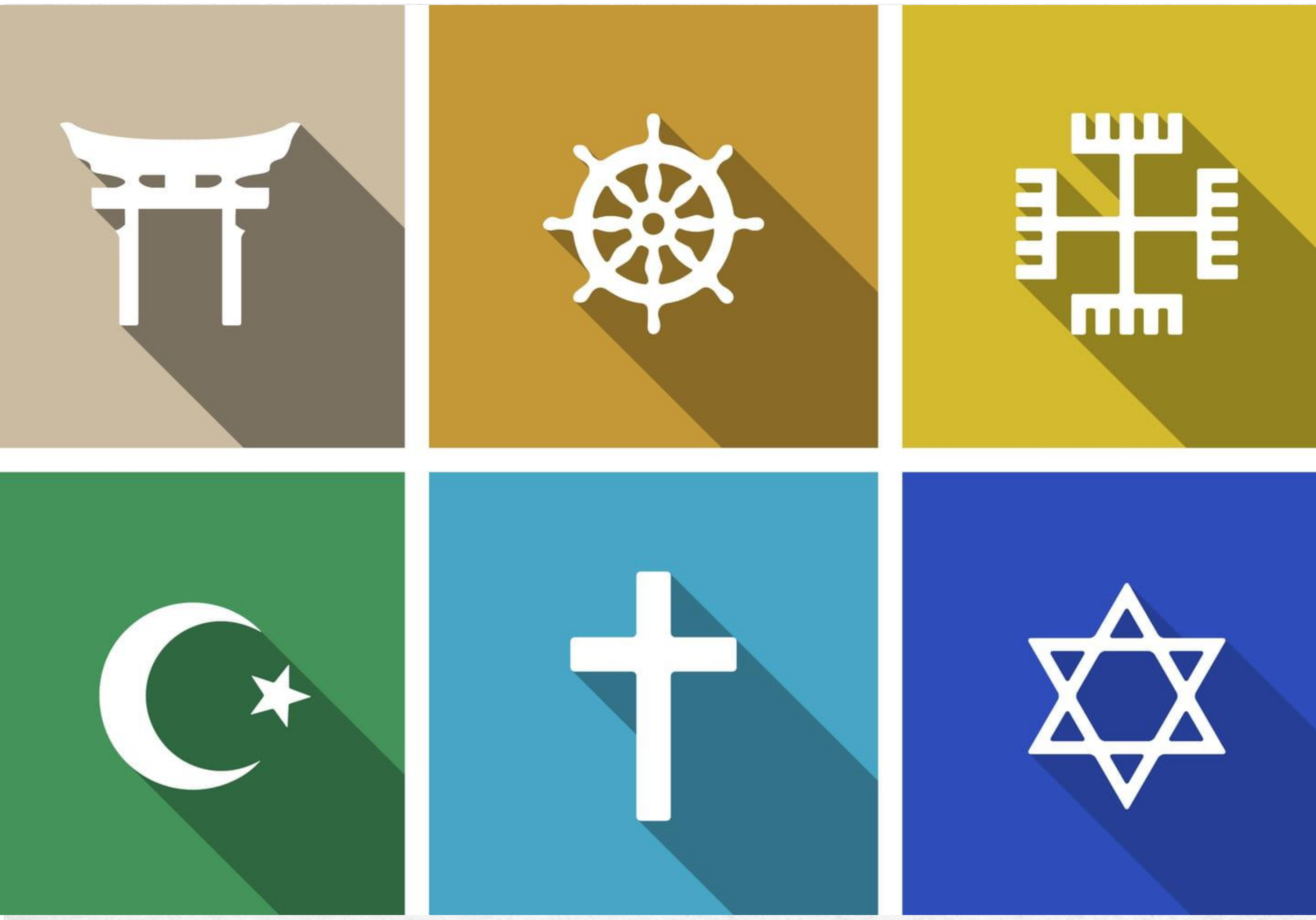
বিপ্লবী পদার্থ বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা - প্রতিবাদের এক শক্তিশেলের নাম। বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত সাফল্যের ঊর্ধ্বে মেঘনাদ সাহা স্থান দিয়েছিলেন দেশকে, জাতিকে, দেশের অর্থনীতিকে। ছয়বার নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন। সারাজীবন লড়াই করেছেন জাতপাত, দারিদ্রের বিরুদ্ধে। আজ মেঘনাদ সাহার জন্মদিবস। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

তথ্যঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার: আনন্দবাজার পত্রিকা, চ্যানেল হিন্দুস্তান, কোলকাতা ২৪×৭ ডট কম, ব্লগ ডট মুক্তমনা ডট কম, উইকিপিডিয়া, ড. চিত্রা রায়, 'ডিসপার্সড রেডিয়েন্স, কাস্ট, জেন্ডার অ্যান্ড মডার্ন সায়েন্স ইন ইন্ডিয়া' : আভা শূর, 'মেঘনাদ

সাহা : দ্য সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড দ্য ইনস্টিটিউট বিল্ডার': শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, ইন্ডিয়ান জার্নাল অব হিস্ট্রি অব সায়েন্স - ২৯ (১), ১৯৯৪, দেশ পত্রিকা - ১৯৯৩, ৯ অক্টোবর সংখ্যা।

"দেশকে সাদাভাবে দেশ বলে জেনে যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চিৎকার করে মা মা বলে, দেবী বলে মন্ত্র পড়ে তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয়, যতটা নেশার প্রতি।"

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরে বাইরে।



ধর্ম, ঈশ্বর এবং নৈতিকতা

- জাহিদ রুদ্র

ধর্ম এবং ঈশ্বর বিশ্বাস প্রতিটা মানুষের একটা ব্যক্তিগত বিষয়। ধর্ম এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস যে কেউ রাখতেই পারে অথবা না রাখতেও পারে, সেটা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু কথা হলো ধর্ম এবং ঈশ্বর বিশ্বাস মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি নয়! সহজাত কথাটা বলতে জন্মগতভাবে লাভ করা মানুষের বৈশিষ্ট্যকেই বোঝায়। উদাহরণ স্বরূপ: ক্ষুধা, রাগ, যৌন অভিলাষ ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলো সকলেরই থাকে। প্রাবল্য অথবা নিয়ন্ত্রণ কম বেশি হলেও এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলো সকল সুস্থ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বাস করে না অথবা ঈশ্বরের চেতনার মধ্যে

উপাসনা, ধর্মের উপর বিশ্বাস রাখাটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি নয়। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকেও ঈশ্বর বিশ্বাস মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি রূপে গণ্য করা হয় না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঈশ্বর বিশ্বাসীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, এর মানে এটা নয় যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিও কমে যাচ্ছে। যদি ঈশ্বর বিশ্বাস মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি নয় তবে এই ধারণা আসে কোথা থেকে?

একটা শিশুর জন্ম হয় নাস্তিক হিসেবে। সদ্যজাত শিশুটি এটুকুও বুঝতে পারে না যে তার ধর্ম কি আর ঈশ্বরও বা কি বস্তু? ঘরের পরিবেশ এবং সমাজ ব্যবস্থাই একটা শিশুকে ধর্মীয়করণ বা ঈশ্বর বিশ্বাসী হিসেবে বানিয়ে নিতে সহায়তা করে। তার ইচ্ছা, চাহিদা কে উপেক্ষা করে অর্থাৎ বাধ্য করানো হয়। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের বিশ্বাস নিয়ে ছোটবেলা থেকেই একটা পরিবেশের সৃষ্টি করা হয় যে শিশু অবস্থা থেকে মনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি এমন একটা দৃঢ় ধারণা আঁকড়ে ধরে যা পরবর্তী সময়ে বহু কম সংখ্যকই এই বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারে। প্রতিটা শিশুই জন্মলগ্নে অনুসন্ধিৎসু হয়ে জন্ম নেয়, কিন্তু তাদের অনুসন্ধিৎসু মনকে ধ্বংস করা হয় এভাবে -

ছোট্ট একটা শিশু তার বাবাকে যদি প্রশ্ন করে 'বাবা, আমাদের পৃথিবী, মানুষ এসব কে সৃষ্টি করেছেন?

বাবার সহজ উত্তর: "সবকিছু, ঈশ্বরই"।

সে আবার জিজ্ঞেস করে "বাবা, এই ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছেন?"

বাবা, বিরক্তিকর উত্তর: "কেন একটার পেছনে লেগে আছিস'? বুঝবে না বাবা, এগুলো বলতে নেই, ঈশ্বর খারাপ ভাবেন ।"

মন্দিরে প্রণাম- প্রার্থনা, মসজিদে নামাজ, জিকির বা চার্চে গডের সম্মুখে প্রে করতেই হবে।

ঈশ্বর-আল্লাহ-গডের গুণকীর্তনের মধ্য দিয়ে ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বর নামের কাল্পনিক ধারণা বিভিন্ন ভাবে মানুষের মনে এভাবে মিশিয়ে দেয়া হয় যে জীবনের পরবর্তী সময়ে এর থেকে মুক্ত হওয়ার প্রবণতা ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

এভাবেই মানুষের মনে ঈশ্বরের ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করে ঈশ্বর এবং ধর্মের ভয় দেখিয়ে ভালো হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। ধর্ম এবং ঈশ্বর বিশ্বাসের ভয় মানুষকে

সৎ পথে আনার হাজার বছরের যে বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়ায় যে ব্যর্থতা রয়েছে তা বহু সময়ে বহু ভাবে আমাদের উপলব্ধি ও প্রমাণিত হয়েছে। এই ধরনের প্রক্রিয়ার বিফলতাই সৃষ্টি করেছিল 'রাম মন্দির-বাবরি মসজিদের নামে হত্যা আর হিংসা। এইধরনের প্রক্রিয়ার বিফলতার জন্যই ধর্মীয় ধারণার বিপরীতে কথা বলা জিওর্দানো ব্রুনোকে জ্বালিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ার বিফলতাই সৃষ্টি করেছে ইসলামিক মৌলবাদের, আফগানিস্তান,ইরান, সহ মুসলিম বিশ্বে চলছে ধর্মযুদ্ধ,নারী নির্যাতন, অশান্তি। এতসব ঐতিহাসিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও, যারা ধর্মে নৈতিকতা এবং ঈশ্বরের ভয় শেখায়, তারা কি সন্ত্রাসীদের ঈশ্বর এবং ধার্মিকদের ঈশ্বরের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে?

ধর্ম এবং ঈশ্বরের নামেই তো চারিদিকে চলছে হত্যা-হিংসা, সন্ত্রাস। একটা ধর্মের উপর অন্য একটা ধর্মের আক্রমণ, হুংকার। এই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আধুনিক চাঁদাবাজি সংস্কৃতিরও। ধর্মের রোষানলে উঠে পড়ে লেগেছে রাজনীতির বিষবাষ্প! ধর্ম রক্ষার নামে অলি-গলিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। তথাপিও কমছে কি হত্যা-হিংসার জেনোসাইড? ধার্মিক হওয়ার প্রতিযোগিতায় কোনো ধার্মিক ঘুষখোর বা অসৎ

উপায়ে পাওয়া টাকা দিয়ে সমাজে প্রতিপত্তিশীল দেখাবার জন্য দান খয়রাত করছে মন্দির, মসজিদে। আর ঐশী আবেগ বা অনুভূতিতে আল্লাহর নামে আত্মঘাতী বোমারু নিয়ে হচ্ছে অগ্রসর। ধর্ম, ঈশ্বর এবং আধ্যাত্মিকতাতেই এইসকল মানুষকে কেন নৈতিকতার শিক্ষা দেয়া হয়না? সন্ত্রাসবাদী এবং বিভিন্ন কেলেংকারীতে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা এই মানুষগুলোকে জিজ্ঞাসা করা হলে ঠিকই বলবে ঈশ্বরের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। কোনো ধার্মিক বা

ধর্ম প্রচারক হয়তো বলবেন ঈশ্বরের প্রতি আস্থা না থাকার দরুণ এহেন অপকর্মে হয়তো লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু তার প্রমাণ কি করতে পারবেন?

এখানে বিগত দিনের 'দ্যা টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের কথা মনে পড়ে গেল। ইংল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত 'দ্যা টেলিগ্রাফ' (২২ মার্চ, ২০১৬) পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী নেদারল্যান্ডে অপরাধের মাত্রা এতোই হ্রাস পেয়েছিল সেদেশে পাঁচটা জেলখানায় ১৩,০০০ টা কোঠা শূণ্য হয়ে পড়েছিল। সেইজন্য এই পাঁচটা কারাগার বন্ধ হয়ে থাকাটাও স্বাভাবিক। যার ফলে কারাগারে কর্মচারীদের চাকরির স্থায়িত্ব সংক্রান্তে প্রশ্নবোধক চিহ্নে এসে ছিল। আকর্ষণীয় কথা হলো দেশটির মোট জনসংখ্যার

৮৩% মানুষই নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী। কেবল মাত্র ১৭% মানুষ ধর্ম কিম্বা ঈশ্বর-বিশ্বাসী। অন্যদিকে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ৯০% মানুষ আস্তিক; ধর্ম এবং ঈশ্বরের উপর তাদের অটল আস্থা। কিন্তু বি.বি.সি.-র দেয়া তথ্য অনুসারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মোট জেলবন্দীর সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষেরও অধিক। এদিকে নেদারল্যাণ্ডে অপরাধীর অভাবে কারাগার বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। অপরদিকে সমস্ত আমেরিকার কারাগারের প্রায় একশো শতাংশ কোঠাই অপরাধীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে আছে। সেইজন্য নাস্তিকের সংখ্যাধিক্য থাকা দেশ থেকে, ধর্ম এবং ঈশ্বরের প্রতি আস্থাশীল লোকের গিজগিজ করতে থাকা আমেরিকাতে অপরাধের মাত্রা বেশি!

বিজ্ঞানের বলে আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নতুন দৃষ্টিভংগীতে দেখতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু বিজ্ঞান কখনও জিজ্ঞেস করে নাই যে ঈশ্বর আছেন না নাই! বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন গুরুত্বহীন। আদিম কাল থেকেই মানব সভ্যতা দুটা বড় প্রশ্নের মুখামুখি হয়ে আসছে। একটা হলো 'কিভাবে' এবং অন্যটি 'কেন'। যে 'কিভাবে' এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে লাগলো তাঁরা বিজ্ঞান জগতে প্রবেশ করলো আর যে 'কেন' প্রশ্ন নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো, তাঁদের একটা সময়ে স্তব্ধ হতে হলো। যেখানে তথ্যের অভাব ছিল অর্থাৎ মানুষের সীমাবদ্ধতা বা বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ছিল। যার ফলে ঈশ্বরের নামে অলৌকিক শক্তির ধারণাটি এসে দাঁড়ালো।

সেইজন্য ঈশ্বরের বিপক্ষে আর কোনো প্রশ্নের স্থান নেই। আর জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধান সেখানে স্তব্ধ হয়ে পড়লো।

ঈশ্বর হচ্ছে মানুষের মনের সৃষ্টি। প্রাকৃতিক পর্যবেক্ষণের পর কল্পনায় কিছু কথা সংযোজন করলেই 'ঈশ্বর'র মতো কোন এক ধারণার সৃষ্টি হয়।

ভারতের অর্থাৎ সিন্ধু উপত্যকার ঈশ্বরসমূহের কাল্পনিক রূপসমূহ যদি দেখা যায় তবে লক্ষণীয় যে তাদের সাদৃশ্য ভারতীয়দের সঙ্গে রিলেটেড । অর্থাৎ দেবী দূর্গার কাল্পনিক রূপটিতে যেভাবে আলঙ্কারিক সৌন্দর্যে আর্য দেবী হিসেবে অঙ্কন করা হয়েছে ঠিক সেইভাবে বাঘের ছাল, অর্ধ উলংগ একজন অনার্য দেবতা হিসেবে শিবের চিত্ররূপ দেয়া হয়েছে। ঠিক সেইভাবে আফ্রিকা বা গ্রীসে দেবতাদের যদি দেখা হয় সেই কাল্পনিক রূপ সমূহ আফ্রিকা বা গ্রীসের মানুষের সঙ্গে মিল দেখা যায়। এই কাল্পনিক ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর সর্বাধিক ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। যেগুলো ধর্ম বেশি প্রাচীন সেখানে ঈশ্বরের বিভাগের কথা বলার বিপরীতে তুলনামূলকভাবে নতুন ধর্ম (খ্রীষ্টান, ইসলাম, প্রমুখ) এবং পুরানো ধর্মের সংশোধনী হিসেবে একজন ঈশ্বরের ধারণা দেয়া হয়েছে।

দেখা যায় একজন বিজ্ঞানী আস্তিক হলে, এই বিজ্ঞানী বহু আস্তিকের উদাহরণ হয়ে উঠেন। ঈশ্বর, ধর্ম বিশ্বাসের কথা আসলে অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত ডিগ্রীধারী বা প্রফেশনাল ডিগ্রীধারী মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে দেখা যায়। কিন্তু কথা হলো প্রফেশনাল ডিগ্রীর সাথে একজনের চিন্তাধারার মানসিকতা সর্বদা সমানুপাতিক নাও হতে পারে। অর্থাৎ একজন ভালো উচ্চ-শিক্ষিত মানুষের চিন্তাধারার থেকেও কখনও একজন অশিক্ষিত মানুষের ভালো চিন্তা, ভালো আদর্শ হতে পারে। তদুপরি বহুজনের প্রশ্ন বা যুক্তি, যদি ঈশ্বর অস্তিত্ব নেই এই পৃথিবীতে তবে কেন বেশি ঈশ্বর বিশ্বাসী? এই প্রশ্নের উত্তর একটা ঐতিহাসিক উদাহরণ দিয়ে কিছু উপলব্ধি করতে পারি। আজ থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করেছিল যে পৃথিবী স্থির অর্থাৎ সূর্যই পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। সেইমতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাও দেয়া হয়েছিল। হাজার হাজার বছর ধরে সেই ধারণা মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেইসময়ত জিওনার্ড ব্রুনো, কোপার্নিকাস, গেলিলিওকে মুখ্য করে যুক্তিবাদী এবং অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্রোতের বিপরীতে গিয়ে এই ধারণার বিরোধিতা করেছিল। যার জন্য তাদেরকে বিভিন্নভাবে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে পূর্বের ধারণার

বিপরীতে সূর্যকেন্দ্রিক ধারণার বৈজ্ঞানিক সত্য রূপ মেনে নিয়েছি! সেইজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিশ্বাস মানেই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাও হতে পারে। আস্তিকের সংখ্যা থেকে নাস্তিক, নিরশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদীর সংখ্যা পৃথিবীতে বহু পরিমাণে কম যদিও বিগত দশক থেকে বহু দেশে নাস্তিক বা মুক্তমনা মানুষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রতিবেদন দেখা গেছে।

কিছু সংখ্যক মানুষ মনে করেন যে একজন ব্যক্তি যে ঈশ্বর বা ধর্মকে মানে না সে "বিশৃঙ্খল, অহংকারী, অনৈতিক, অমানবিক।নৈতিকতা এবং ধর্ম-বিশ্বাসকে বিভ্রান্ত করা অনেকের মনে জাগা এটি স্বাভাবিক প্রশ্ন ।

কিন্তু ঈশ্বর বা ধর্মের ভয় দেখিয়ে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়া একটা অবৈজ্ঞানিক ধারণা।

নৈতিকতা মানে শুধু ঈশ্বরের বিশ্বাস নয় অথবা ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে তৈরি করা কোনো ধর্মাচরণও নয়। নৈতিকতা মানে সকাল-বিকেল ঈশ্বরের গুণকীর্তন করা নয়। নৈতিকতা মানে কোনো ধর্মের ধর্মীয় রীতিনীতির উপর আস্থা রেখে ভক্তিভাব নয়। নৈতিকতা হল সাধারণ নিয়ম ও প্রবিধানের সমষ্টি যা কারো ক্ষতি না করে নিজের এবং সমাজের উপকার করা। উচ্চ-নীচ, হিন্দু মুসলমান সকল জাতি-ধর্মের

মানুষ সমান মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার মানসিকতাই হচ্ছে নৈতিকতা। নৈতিকতা হল এই ধারণা যে ঘুষ না নিয়ে কিছু সঠিক কাজ করা । নৈতিকতা হল হৃদয়ে উপলব্ধি করা যে আমার নিজের স্বার্থে সমাজে অন্যদের ক্ষতি না করা। কারো কোন ক্ষতি না করা, চুরি না করা এবং সবার সাথে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে কোন ধর্মের প্রয়োজন নেই। এই ন্যূনতম নৈতিকতা পশুর মধ্যে ও দেখা যায়। নৈতিকতা এবং ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। নৈতিকতা এসেছে মানুষের সমাজের জন্য নিজে তৈরী করে নেয়া কিছু সমাজনীতি থেকে। সেইজন্য নৈতিকতা সমাজে নীতির সঙ্গে জড়িত শব্দ। সমাজ ছাড়া অন্য প্রাণীদের কোনো কৃত্রিম নৈতিকতা নেই। নৈতিকতা যেহেতু সমাজ নীতির সঙ্গে জড়িত শব্দ, অনেকেই ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতাকে সমাজনীতির অংশে নৈতিকতার অধীনে নিয়ে আসেন । কিন্তু ধর্ম, ঈশ্বর এবং আধ্যাত্মিকতাকে সমাজনীতির অধীনে এনে নৈতিকতার মর্যাদা দিলে কখনো কখনো এর পরিণতি হয় ভয়াবহ। এই ধরনের নীতি থেকে উদ্ভূত নৈতিকতা মসজিদ ভেঙে মন্দির নির্মাণ বা মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণের পক্ষে। এই ধরনের নীতি থেকে সৃষ্ট নৈতিকতা আবার রাম রহিমের মতো ধর্মীয় নেতাদের জন্ম দিতে পারে।

ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস (World Happiness Report) রিপোর্ট অনুযায়ী, রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা পরিচালিত একটি বার্ষিক জরিপে দেখায় যে ধর্ম এবং ঈশ্বর বিশ্বাসের সাথে নৈতিকতার কোন সম্পর্ক নেই। দেশসমূহের জরিপে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, মানবাধিকার এবং ধর্মীয় বিশ্বাস সহ আরও অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্বের ১৫৬টি দেশের জরিপ অনুযায়ী, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক এবং নরওয়ে এ বছর বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। দুঃখজনকভাবে, ভারত 140 তম স্থানে রয়েছে।মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ ধর্মীয় দেশ রয়েছে ৫০ এর নীচে। ঠিক সেইভাবে Institute for Economics and Peace (IEP)র তত্ত্বাবধানে সমীক্ষা চালিয়ে ২০১৮ সনের Global Peace Indexর প্রতিবেদনে ভারতের সুখী সূচকে একটি বিভ্রান্তিকর জায়গায়!

মজার ব্যাপার হল, ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর জোর দেয় এমন লোকে ভরা একটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক এবং সংশ্লিষ্ট দেশের সুখের সম্পর্ক বিপরীত। এর মানে হল যে দেশগুলিতে বেশি সংখ্যক মানুষ যারা ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করে তাদের সুখের স্তর নিম্নতর হয়,

যেখানে কম সংখ্যক মানুষ যারা ঈশ্বর এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাদের সুখের স্তর বেশি। প্রতিবেদনে শীর্ষ পাঁচটি দেশে স্বঘোষিত নাস্তিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি নাস্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষে পরিপূর্ণ দেশগুলোতে মানুষের মধ্যে খুন-হানাহানি বেশি হওয়া উচিত ছিল বলে প্রচলিত ধারণা! কিন্তু কেন এমন দেশগুলো বেশি সুখী? যদিও পরিসংখ্যান একটি সম্পূর্ণ উপসংহার টানতে পারেনি যে ঈশ্বর বা ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষকে অপরাধ করতে প্ররোচিত করে, আমরা এই ধরনের পরিসংখ্যান থেকে একটি যৌক্তিক উপসংহার টানতে পারি যে ধর্ম এবং ধর্মীয় বিশ্বাস অপরাধ থেকে মানুষের সিংহভাগকে দূরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে!

ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে মূলত ভয়ের উপর, রহস্যময়ের ভয়, পরাজয়ের ভয়, মৃত্যুর ভয়। ভয় নিষ্ঠুরতার উৎস। কাজেই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে নিষ্ঠুরতা আর ধর্ম হাত ধরাধরি করে চলছে। ধর্মকে আমি ভয় থেকে উৎসারিত একটি ব্যাধি আর মানবজাতির অবর্ণনীয় দুঃখ - দুর্দশার উৎস বলে মনে করি।

– বার্ট্রান্ড রাসেল (নোবেলবিজয়ী বিখ্যাত দার্শনিক)



অচলায়তন

- মহম্মদ মহসীন

সম্পর্কে না হলেও মেলামেশায় খুব কাছের আত্মীয়। আমার অবশ্য তার বাড়ি যাওয়া হয় না বহুদিন। তবে ওরা মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়ি আসার ফুরসত পায়। আমার অনেক উপকারও করে দেয়।

আসতে তাদের বেশ দেরি হলো। দেরি হওয়ার কারন হিসাবে পুজোর ভীড় বলতেই সে শোনালো এক কাহিনী। আমাদের জানা কাহিনী, কিন্তু সে বললে তার মনের মাধুরী মিলিয়ে মিশিয়ে পল্লবে পল্লবে জড়িয়ে, আপন রঙ ছিটিয়ে, ছড়িয়ে।

দুর্গা কাহিনী। দুর্গা হল এক বারাঙ্গনা। আর্যরা ভারতবর্ষ দখল করতে এসে যুদ্ধের প্রতিপক্ষ হিসাবে এদেশের আদি

বাসিন্দাদের সম্মুখীন হলো। তাদের সাথে যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারলো না। কিন্তু এদের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু ব্যাপার স্যাপার জেনে গেল। এরা কোনো নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করে না। কাজেই তারা দুর্গাকে যুদ্ধে এগিয়ে দিয়ে নানান অস্ত্রের যোগান দিয়ে গেল। যারা সুরা পান করে তারা হলো সুর। আর যারা সুরা পান করেনা তারা হলো অসুর।

মহিষী মানে রাণী, এ আমরা অনেকেই জানি, যেমন রাজমহিষী।

মহিষ মানে রাজা। অসুরদের রাজা হলো মহিষাসুর।

তো সেই মহিষাসুরকে যখন মারতে এলো দুর্গা। রাজা তার সাথে যুদ্ধই করলো না, বীরের মৃত্যু বরণ করলো।

এই লজ্জার বিজয়কে কাপুরুষ জয়ীরা আজও এমন একটা প্রতিমা বানিয়ে উল্লাস করে।

এই প্রতিমার মূল কথা হলো যুদ্ধ জয়।

তার কাহিনী শুনলাম। ভাবলাম, এই ব্যক্তিটি প্রতিদিন নামাজ পড়তে পারে, রমজানে সারামাস উপবাস করতে পারে, কিন্তু এর মাঝেও আছে কিছু যুক্তিশীল ধ্যানধারণা। কাজেই এর কাছে মুখ খোলা যেতে পারে।

আসলে বুঝিনি, ধার্মিক মানেই ধর্মান্ধ। সে বুঝবে যুক্তি?

তাকে বললাম, দেখো ধর্ম ব্যাপারটাই এমন, ধার্মিকেরা তোমার মতো এতটা গভীর-গভীর বিষয়ের খোঁজই রাখে না।

এই আমাদের হজরত মোহাম্মদের কথাই ধরো না। একদিন ভোরবেলা বলে দিলেন গাধার চেয়ে একটু বড়, খচ্চরের চেয়ে একটু ছোট প্রাণী বোরাকে চড়ে আকাশে উড়ে আল আকসা মসজিদে যান, মহাকাশ ভ্রমণ করেন, আকাশের ১নং গেট, ২নং গেট এইসব খুলে আল্লাহের সাথে দেখা করেন।

আগ্রহী পাঠকের জন্য, মেরাজের গাল গল্পটি একটু বিশদে জানার জন্য নিচে লিংক দেওয়া হল:-

রেফারেন্স : link

আবার দেখো উইকিপিডিয়া বলছে, এক হাদিস মতে

ঐ রাতে তিনি উম্মে হানীর ঘরে ছিলেন, আবার অন্য হাদিস মতে তিনি কাবা মসজিদে ঘুমাচ্ছিলেন।

এখন দেখো দুই রকম কথা হচ্ছে, কাজেই এখানে দুটোই সত্য হতে পারে না, এর একটি তো অবশ্যই মিথ্যা। আর বোরাকের কথা তো মিথ্যাই। কারন প্রাণীবিজ্ঞানে এমন কোনো প্রাণীর কথা নেই যেটি মহাকাশে উড়তে পারে। পাখী ওড়ে বাতাসে। মহাকাশে সম্ভব নয়। এটা তো মোহাম্মদ স্পষ্টত মিথ্যাচার করেছেন।

কথা তখনও শেষ হয়নি। আমার সেই আত্মীয় তেড়ে এলো আমার দিকে, বললে, আর একটা কথা বলবেন না। তাহলে আমি কিন্তু কোনো রেয়াত করবো না।

আমার নবীজীর সম্বন্ধে যে কু-ইঙ্গিত করবে, মিথ্যাচারী বলবে তার ব্যবস্থা করতে আমার এতটুকু আফসোস হবে না।

আমি প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম, পরে উপলব্ধি করতে পারলাম, এটিই স্বাভাবিক।

এরা প্রকৃতই অন্ধভক্ত। যুক্তি বোঝে না। অন্য ধর্মের অলৌকিকতায় সমালোচনার সাইক্লোন বইয়ে দেয়, নিজ ধর্মের কথা এলেই অন্ধত্বের কুৎসিত নখ দাঁত বেরিয়ে আসে।



তবু শান্ত স্বরেই বললাম, সে নাহয় তুমি মারধোর করবে, কিন্তু কথাটা হলো, হাতের কাছেই তো আছে, উইকিপিডিয়া, দেখে নিতে পারো। সে এসব দেখে ইমান অর্থাৎ মোহাম্মদের উপর বিশ্বাস নষ্ট করতে চায় না। আমাদের যাদের ইমান নষ্টের আশঙ্কা নেই, আমরা দেখে নিতে পারি তো। (লিঙ্ক: link....)

আমার আত্মীয় অবশ্য এসব দেখতেই চাইল না। তার বক্তব্য কাফেররা এসব লিখেছে। তারা শয়তানের অনুসারী। যারা মোহাম্মদের কথা বিশ্বাস করতো না, তাদের কাফের অর্থাৎ অবিশ্বাসী বলা হত। মোহাম্মদের এক কাকা আবু লাহাবও তার কথা বিশ্বাস করত না। আমার আত্মীয়টি বলে, এসব মিথ্যা হলে কোটি-কোটি লোক চুপ থাকতো? বললাম, মোহাম্মদকে উম্মেহানি এ কাহিনী বলতে নিষেধ করেছিল। আর কাফেররা তো শুনেই তৎক্ষণাৎ মিথ্যা বলেছিল। এমনকি মোহাম্মদের স্ত্রী আয়েশাও মোহাম্মদ সশরীরে মহাকাশে যাওয়ার ঘটনাকে সত্য বলে মেনে নেন নি। উৎস: উইকি।

"সারা পৃথিবী যখন সত্য বলে মেনে নেয়, সেখানে কয়েকজন কাফের মিথ্যা বললে কী যায় আসে?"

তাকে বোঝালাম, সত্য বলার জন্য লোকসংখ্যা নির্ভর করে না। হাজার লক্ষ কোটি লোকে সত্য সত্য বলে চিৎকার করলেও মিথ্যাটা সত্য হয়ে যায় না। সত্যটা হাজার লোকে বললেও সত্য, একজন বললেও সত্য।

আর এ জগতে এক ধর্মের লোকের অন্য ধর্মে বিশ্বাস নেই। কাজেই কোরাণে তথা আল্লাহে বা মোহাম্মদে বিশ্বাসীর সংখ্যার চেয়ে অবিশ্বাসীর সংখ্যাই বেশী। সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই এটি বলা যায়। কাজেই এই বিশ্বে অবিশ্বাসীর সংখ্যাই বেশি, যদিও সংখ্যার উপর সত্য নির্ভর করে না।

আরেকটি ঘটনার কথা বলি।

আমার এক দাদা আছেন। তিনি একটু বেশি রকমেরই ঠাকুরভক্ত। পেশায় তিনি ডাক্তার। এম.বি.বি.এস।

আমার সেই আত্মীয়ের গল্পটি, অর্থাৎ দুর্গার কাহিনী তার গ্রুপে পোষ্ট করলাম। আমার লেখাটি বেশ সাবধানতা নিয়েই লেখা। তাতে আমার নিজের কোনো কথা ছিল না। ছিল আনন্দবাজারে প্রকাশিত দাশাই পরব নিয়ে লেখা। এই পোষ্টটি করার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রুপ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। এটা তারা সহ্য করতে পারলেন না। বাজারে দেখা হলে বেশ উষ্মা সহ তক্কো (তর্ক বা বিতর্ক নয়) করতে

লাগলেন। শেষে আমার নামে রটালেন, আমি না কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর উস্কানি দিচ্ছি।

এই যে উগ্রতা, তার ভিত্তি হল অন্ধ ভক্তি, অন্ধবিশ্বাস। এখানে লেখাপড়ার কোনো প্রভাবই নেই।

ধার্মিক মাত্রেই ধর্মে অন্ধ। সামজে একটু চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়।

এক ধর্মের লোকের বুদ্ধিতে অন্য ধর্মের অবাস্তবতা, অলৌকিকতা খুব সহজেই ধরা দেয়। ভক্তিতে অন্ধ হয়ে যান নিজ ধর্মের বিষয় এলেই। তখন একবার বাস্তবে আসেন, আবার পরক্ষণেই ভাব জগতে চলে যান। নিজের অন্ধবিশ্বাস পোক্ত করার জন্য যেসব যুক্তির অবতারণা করেন, তা আসলে নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার জন্যই, নিজেরা যে একেবারেই অন্ধ সেটাই জাহির করার জন্য।

যাই হোক, এখানে এই সব কথা অবতারণার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হলো, এই সব ধার্মিক তথা ধর্মান্ধদের মধ্যে যুক্তিশীল মানসিকতা আনার কাজটা খুব-খুব কঠিন। এই দুরূহ কাজ তবু করে যেতে হবে। অন্ধকার কেটে একদিন আলো ফুটবেই। এ আশা, এ প্রত্যয় নিয়েই তো চলেছি আমরা।



দশমীর দুপুরের অলস চিন্তা

- রা হু ল রা য়

লেখাটি লিখছি ৫ই অক্টোবর, এই বছর দিনটি বিজয়া দশমীর। শহরে বিশাল আয়োজনে ভাসান চলছে। আরো পাঁচটি বাঙালি অধ্যুষিত জায়গার মতোই আসাম রাজ্যের এই শহরটিতেও দিনটি প্রতি বারের মতো এবারেও সাড়ম্বরে উদযাপন করা হচ্ছে। পাল্লা দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তার ছবি, আবেগস্ফীত বার্তায় ভরে উঠেছে। আর হবেই বা না কেন। মোটের ওপর ধর্মভীরু এই শহরের জনসংখ্যা তো আর কম নয়। আবার সামাজিক মাধ্যমে উপস্থিতির দিক থেকেও এই শহরের মানুষ পিছিয়ে নয়। এই শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দুদের প্রধান উৎসব। প্রচলিত বিশ্বাস মতে ঘরের মেয়ে বছরের এই সময়ে ঘরে

ফিরে আসে। দশমীর দিনে সেই মেয়ে পতিগ্রহে পতিগৃহে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই দিনটিকে ঘিরে সাধারণ মানুষের বিশেষ আবেগ থাকে। চিরাচরিত এই আবেগের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে ভাবলে দেখা যায় যে মাটির প্রতিমা তৈরি করে চারদিন সাড়ম্বরে পুজো করে বিসর্জন, সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই জ্ঞানের অভাবে গড়ে ওঠা প্রাচীন বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসকে তুষ্ট করার আয়োজন মাত্র। তবে লক্ষণীয় যে এই আয়োজনের সঙ্গে 'ঘরের মেয়ে', 'গৃহ', 'শুভ শক্তি'র মতো শব্দগুলো ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে।

এই তো গেল একটা দিক। এই দিকে 'ঘরের মেয়ে', 'ঘর', 'অশুভশক্তির ওপর শুভশক্তির জয়' আছে। আছে আত্মীয়তার মাধুর্য। আছে বুকভরা আবেগ। এবার দেখা যাক অন্য একটি দিকে। এই দিকটি আগেরটার মতো এক পক্ষের মাত্র ক'দিনের সাড়ম্বর স্থায়ীত্ব নিয়ে থাকে না। এর স্থায়ীত্ব কোনো অলৌকিক শক্তিকে কল্পনা করে নয়। এই স্থায়িত্ব বছরজুড়ে, এর উপস্থিতি অনাড়ম্বর সাধারণ মানুষের জীবনে, মননে। এদিকে আমরা দেখি একদল লোভী মানুষ, তাদের অঙ্গুলহেলনে অঙ্গুলিহেলনে সরকার ও সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের কর্তাদের সামনে ফি বছর মানুষের নিরুপায় অবস্থা। আমরা দেখি কিভাবে এদের পায়ে দলে দলে মহিলারা পড়ে নিজেদের ঘর রক্ষার জন্য ভিক্ষা করে, কোলের শিশুকে এগিয়ে দিয়েও এই লোভীদের পথরোধ হয় না। না, এই দৃশ্য খুব বেশি দূরের নয়, সময় ও

ভৌগোলিক, কোনোদিকেই। আজ যে শহরে শারদীয় দুর্গোৎসব নিয়ে এতো জাঁকজমক, তার থেকে মাইল পনেরোর দূরত্বের মধ্যেই আছে ডলু চা বাগান। সবুজে ঘেরা, হ্রদের ধারে পরিপাটি করে সাজিয়ে তোলা ছবির মতো সুন্দর একটি বাগান। ব্যবসায়িক দিক থেকে সফল এই বাগানের সঙ্গে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের জীবন জড়িয়ে আছে। গত মে মাসে শ্রমিকদের প্রবল আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে এই চা বাগানে রাজ্য সরকার বিমানবন্দর বানানোর নামে বুলডোজার চালিয়ে দিয়েছিল। যদিও কিছুদিন পরেই জানা যায় এই ব্যাপারে কেন্দ্র সরকারের কিছুই জানা ছিল না, অনুমোদন দেওয়া তো দূরের কথা। কথা হল সেদিন বিশাল পুলিশ বাহিনীর সামনে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরাও নারী ছিলেন, এই বাগানটিই বংশপরম্পরায় এঁদের ঘর ছিল। কল্পকথার কৈলাশ পর্বত না হলেও কয়েক পুরুষ ধরে নিজেদের ঘাম, রক্তের বিনিময়ে তৈরী সেই ঘরের মাহাত্ম্যই বা কম কিসে।

আজকে ‘ঘরের মেয়ে’ ঘর শূন্য করে চলে যাচ্ছেন বলে যারা পাতার পর পাতা লিখছেন, সেদিন যে কেন অবাক নিস্তব্ধতায় তাঁরা এই রক্ত মাংসের মেয়েদের ঘরছাড়া করাকে সমর্থন করেছিলেন তাঁরাই জানেন।

শুধুমাত্র বিশ্বাসের জোড়ে জোরে মাটির তৈরি প্রতিমা 'ঘরের মেয়ে'র স্থান পেয়ে যায় আর এই রক্তমাংসের মানুষগুলোর কপালে জোটে একরাশ বঞ্চনা ও অবহেলা।

এই পরিচিত্র কিন্তু শুধু এই শারদীয় দুর্গোৎসব বা দেশের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাসকারী মানুষের মধ্যেই সীমিত তা কিন্তু নয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে গুজরাট, কেরালা থেকে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিসগড়, হিমাচল, উত্তরাখণ্ড, মানুষ ভিন্ন, আরাধ্য দেব-দেবী ভিন্ন কিন্তু কল্পকথার সেই আরাধ্য দেব-দেবীকে নিয়ে আবেগের যেমন শেষ হয় না, তেমনি রক্তমাংসের অসহায় মানুষের দুঃখ, কষ্ট, বেদনার প্রতি নির্বিকার, বীতস্পৃহ মনোভাবেরও বদল হয় না। কোথাও বাঁধ, কোথাও মূর্তি, কোথাও খনি আবার কোথাও রেলপথের নামে এভাবেই শতসহস্র উমা, পার্বতীরা তাদের কৈলাশ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। পুজোর মণ্ডপে দেবী দুর্গার হাতে অসুরের মৃত্যু আমাদের অতি পরিচিত দৃশ্য। পৌরাণিক কাহিনি মতে দেবী দুর্গা এখানে একাধারে নারীশক্তি ও শুভশক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন, অন্যদিকে অসুর অশুভশক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। তবে ধর্মের ইতিহাস অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করে। উজ্জ্বল বর্ণের আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিতা দুর্গা এখানে আক্রমণকারী, রণকৌশলী আর্য ও কৃষ্ণবর্ণের অসুর এখানে আদি ভূমিপুত্রদের প্রতিনিধিত্ব করেন। আজকের

সময়ের নিরিখে বিজয়া দশমীতে সেই পৌরাণিক কাহিনিকে পাথেয় করে 'অশুভশক্তির' ওপর 'শুভশক্তির' জয় উদযাপন করা হয়। অথচ তথাকথিত এই দেবীপক্ষ নিয়ে আমাদের বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসকে ভিত্তি করে অনুষ্ঠানাদির বাইরে গিয়ে যদি দেখি, সেখানে কিন্তু আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ধর্মীয় ইতিহাসের বারংবার পুনরাবৃত্তি।

সেখানে আজও ভূমিপুত্র, অনুন্নত, শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে থাকা প্রান্তিক মানুষেরা সমাজে ক্ষমতাবানদের আগ্রাসন লোভের কাছে এভাবেই পরাভূত হন।

তাদের কথা শোনার, তাদের দুঃখ বোঝার ইচ্ছা কারোর নেই। জায়গা বদলায়, সময় বদলায়, দৃশ্য বদলায় না। প্রশ্ন উঠতে পারে এই অবিচারের কি কোনো প্রতিবাদ হয় না? সাধারণ মানুষ বা অন্ততঃপক্ষে যারা দিনের পর দিন ধরে এভাবে অত্যাচারীত হয়ে আসছেন তারা কেন প্রতিবাদ করেন না। দেশে থানা আছে, আদালত আছে। প্রশ্নের উত্তরটা হল সমসাময়িক সভ্যতা থেকে কয়েক ধাপ পিছিয়ে থাকা এই মানুষদের প্রতিবাদের 'অস্ত্র' বা 'রণকৌশল' সবই সেকেলে।

তাদের কাছে থানা, আদালত কোনো কিছুই বিচার, ভরসা দিতে পারে না।

সংবাদমাধ্যমের কাছে এরা খুব বেশি মাত্রায় অচ্ছুৎ।



যদিও বা কোনোদিন, কোনোভাবে এই প্রান্তিকরা একান্ত নিরুপায় হয়ে তাদের প্রতি হয়ে আসা এই অবিচারের প্রতিবাদ করেন তখন তাদের অবস্থা হয় অসুরের মতোই। মরতে তো তাদের হয়ই, উপরন্তু সমাজের সামনে সভ্যতার নিখাদ শত্রুর পরিচয়ও পেতে হয়। সংবাদমাধ্যম যেমন তাদের রাতারাতি জঙ্গি বানিয়ে দেয়, সরকার মাওবাদী তকমা দিয়ে দেয়। ধর্মীয় ইতিহাসের ভূমিপুত্র সেই অসুর প্রচারের ঠেলায় পৌরাণিক কাহিনীর সভ্যতা বিরোধী, নারীর অপমানকারী অসুর হয়ে যায়। আর যারা চরম স্বার্থপরতার প্রমাণ দিয়ে এই চরম অমানবিক কাজটি করে এরাই হয়ে

ওঠে সমাজের কাছে সভ্যতার ধ্বজা বহনকারী অগ্রদূত। জ্ঞান ও চেতনার অভাবে আমরা, সাধারণ মানুষ এই অসহায়, নিঃস্ব মানুষদের ওপর তাদের এই জয়কেই সভ্যতার জয় বলে মেনে নিই, সাড়ম্বরে উদযাপন করে আত্মতুষ্টি লাভ করি।

রাহুল রায়, শিলচর।

"প্রথম যখন ধর্মপ্রচারকেরা এলো, তখন আমাদের ছিল জমি আর তাদের ছিল বাইবেল। তারা আমাদের শেখালো, কি করে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করতে হয়। একদিন যখন আমরা চোখ খুললাম দেখি আমাদের কাছে বাইবেল আর ওদের কাছে আমাদের জমি।"

- জোমো কেনিয়াত্তা

(একজন আফ্রিকান কৃষক)



সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি

- ধী রা জ দ ন্ড পা ট

মানব প্রকৃতির মধ্যে মন্দভাবটা ঐতিহ্য ও শিক্ষার দ্বারা পরিমার্জন ঘটিয়ে যথার্থ মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটানোকে স্বাভাবিক ভাবে সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত যে স্থূলতা অবিকৃত তাকে তাহাই অপসংস্কৃতি। পুরোণ পুঁথি পত্রে নর নারীর যথেচ্ছ নাচগান, মেলামেশা ও যৌন সম্পর্ক ও পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে কাহিনীর ছড়াছড়ি। এমনকি মধ্যযুগেও এমন অবারিত মেলামেশার সুযোগ ছিল।

তারপর ধীরে ধীরে সমাজব্যবস্থায় বিধি নিষেধ কঠোর হলেও গোপনে মেলামেশার প্রচুর উদাহরণ রয়েছে।

বৈদিক যুগে নারী নিজেই নিজের বন্ধু বা সঙ্গীকে পছন্দ করার সুযোগ পেয়েছিল। এখনও এদেশের আদিবাসীদের মধ্যে সেই ধারা প্রচলিত আছে।



বিগত পাঁচ ছয় শতাব্দী জুড়ে সমাজে নরনারীর অবাধ মেলামেশা নিয়ে কঠোর বিধি নিষেধ বলবৎ থাকলেও, বর্তমান সমাজে এই প্রাচীন বিধি নিষেধ কে অগ্রাহ্য করার প্রবনতা লক্ষ্য করা গেছে। আসলে মধ্যযুগে যে বিধি নিষেধ আরোপিত ছিল, অর্থাৎ রক্ষণশীল সমাজের রীতি নীতিকে তুড়ি মেরে একটা স্বাভাবিক প্রতিবাদের প্রকাশ ঘটছে। কালের তালে আগত আবহের সাথে রক্ষণশীল সমাজ যদি

সহিষ্ণুতা দেখায় তবে নরনারীর বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা হয়তো শোভনতা প্রাপ্ত হবে। উচ্ছৃংখলতা শব্দের অর্থ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

স্বাভাবিক ভাবে দেখা যাচ্ছে, অবাধ মেলামেশা, মানসিক বা জৈবিক টানে যুগ যুগ ধরেই ছিল। যেটা সমসাময়িক সমাজে অনুমোদিত নয়। সেটাই গোপন অভিসার হিসেবে প্রচলিত। প্রকৃত পক্ষে জৈবিক প্রেরণা, বা অনেকটা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কৌতুহল বা আকর্ষণের নিরীখে। আসলে জৈবিক টানকে প্রতিহত করার তাগিদে সোজা পথের সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় গোপন পথে জৈবিক প্রকৃতি চরিতার্থ করা। এটাকে পুরোপুরি অপসংস্কৃতির দোহাই না দিয়ে জীবের স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদাটাকেও কিছুটা মান্যতা দেওয়া যেতে পারে।

পর্ব- ২

বেদ হলো আর্য্য গোষ্ঠীর জীবন বোধ সংক্রান্ত চিন্তাধারার প্রথম প্রকাশ। যার দ্বারা আধিপত্য কায়েমেরও চেষ্টা হয়েছে, ওই গোষ্ঠীর দ্বারা। লোকায়ত হলো এদেশিয় আদিম অধিবাসীদের জীবন বোধের চিন্তাধারা। কালক্রমে আর্য্য অনার্যর মিলনে যে শঙ্কর জাতের সৃষ্টি হয়, তাদের সংস্কৃতির মাধ্যমে বাঁধাই ছিল বৈদিক দর্শন। আর্য্যরা তাই

আদিবাসীদের লোকায়ত দর্শনকে অপসংস্কৃতি আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে মুছে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে।

গান বাজনা, নাচ গান, পোশাক আশাক, ইত্যাদি যুব সম্প্রদায়ের আবেগের পরিস্ফুটন। ফলে সমাজে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

কারন যুব সম্প্রদায়ের রুচির সাথে তথাকথিত সমাজের ধারক ও বাহক বয়স্কদের মিল খায় না। শুরু হয় সামাজিক সংস্কৃতি অপসংস্কৃতির সংঘাত।

তারুণ্যের প্রভাব ও রুচি কতটা পরিমান প্রাধান্য পাবে বা কালক্রমে এই ধারা ভবিষ্যতে কোন পর্যায়ে পৌঁছাবে, তাতে ভবিষ্যত সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি অপসংস্কৃতির নিরিখে কেমন রূপ ধারণ করবে, এটা একটা প্রশ্নই বটে।

সংস্কৃতিকে কোন গণ্ডির মধ্যে বাঁধা যায় না। প্রাকৃতিক ভাবে তা সতত পরিবর্তনশীল। বর্তমান যুবসমাজই বহন করে নিয়ে যাবে পর্যায়ক্রমে আগত প্রজন্মের জন্য। তাই সংস্কৃতির প্রশ্নে সামাজিক সহিষ্ণুতার প্রশ্ন বার বার উঠেছে, উঠবে।

অস্বাভাবিক আতিশয্যের ফলে কিছুটা বাড়াবাড়ি হতে পারে, কারন রুচির পরিবর্তন তো কালানুক্রমিক। পরিবর্তন যুগকে প্রতিভাত করলেও সবটা বজায় রাখা কঠিন। সুরুচি, শোভনতা, সুন্দরতার রূপান্তর ঘটে, যদি উন্মাদনায় পৌঁছায়

ধৈর্যশীল হতে হবে। আতিশয্য, উন্মাদনা স্থায়িত্ব পেতে পারে না, সংস্কৃতি নিজেই নিজের রূপ ধারণ করে।

আতিশয্যের প্রকাশই রুচিকে পীড়িত করে। আতিশয্য ছাড়া ফুর্তি নাকি পূর্ণতা পায় না। নারীর পোশাক-আশাক, ধূমপান, চুলছাঁটা, ছেলেদের লম্বা চুল রাখা এগুলো নাকি অপসংস্কৃতির লক্ষণ। কেন? ধূমপান তো মোঘল আমলেও প্রচলিত ছিল। নিকট অতীতে দু-দশক পূর্বেই এদেশে মেমসাহেবদের ধূমপান করতে দেখা গেছে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপূর্ণ বাড়িতে নারী গড়গড়াও টানতো। সেখানে প্রান্তিক গরীব শ্রমিক শ্রেণী হুঁকো বা বিঁরি টানতো। উপর তলার নরনারী বিদেশী মদে, আর নীচের তলা শস্তার মদে ডুবে থাকে। আঙ্গুল ওঠে শুধু মধ্যবিত্ত সমাজের বেলায়।

উনিশ শতকে এসে মদ্যনিবারণী সভা রাশ টানার চেষ্টা করেছে। যে কারনে আজকাল মধ্যবিত্ত সমাজেই নারীদের অভ্যাস বশতঃ মদ্যপান ও ধূমপানে অপরাধবোধ কাজ করে।

তাই বলা যায় রুচির আতিশয্য যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা সীমা অতিক্রম করে, ততক্ষণ আতঙ্ক বা আপত্তি থাকা উচিৎ নয়।

যদিও অতিরিক্ত ধূমপান ও মদ্যপান নরনারী উভয়ের ক্ষেত্রেই স্বাস্থহানিকর। তাই মাত্রার

নিরীখে মদ্যপান ও ধূমপান যদি সাময়িক আরাম বা আনন্দের কারন হয় আপত্তি থাকা উচিৎ কি?



পর্ব - ৩

বিগত শতাব্দীতে কিশোর ও যুবসম্প্রদায় ছিল তৎকালীন সমাজের একান্নবর্তী পরিবারের আওতায়। মানসিক মুক্তি ইচ্ছানুরূপ ছিল না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সবাই ছিল বাল্য অবস্থা থেকে বিশেষ পরিচিত বা আত্মীয়। ফলে ভয় ব্যপারটা মনের মধ্যে সদা জাগ্রত থেকে একটা অলিখিত চাপ প্রয়োগ করতো। ব্যতিক্রমী হওয়ার সাহস সবার সব ক্ষেত্রে কঠিন ছিল। ব্যতিক্রম চোখে পড়লেই গুরুজনরা আঁতকে উঠতেন, গেল গেল রব উঠতো। বোধগম্য হতোনা কতদূর পর্যন্ত নির্দোষ হৈ-হুল্লোড়

অনুমোদিত না হলে এ প্রজন্মের রোষানলে পড়া যায়। চলতো প্রথা লঙ্ঘনের, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা নিরবধি।

বর্তমানে ব্যতিক্রমী পথটা শহরই দেখিয়েছে। যেহেতু নানা ভাষাভাষি, নানা মত, নানা সংস্কৃতির একত্র বসত, এক মিশ্রিত সমাজ। তাই সামাজিক গণ্ডিটা লঙ্ঘন সহজ। গুরুজনের তীক্ষ্ণ নজরকে এড়িয়ে চলার অফুরাণ সুযোগ। এ সবের বিরুদ্ধতা, প্রতিস্পর্ধার বাসনাটাকে উসকে দেওয়ার ফল মোটেই আশাপ্রদ হবে না। এই গণ্ডি অতিক্রম বিগত শতাব্দীর বশংবদতার প্রতিবাদ। বর্তমান প্রজন্মের স্বতন্ত্র জীবনীশক্তির প্রভাবে স্বাভাবিকতার প্রকাশই এমন প্রতিবাদী হওয়ার কারন। এরা প্রাণশক্তিতে ভরপুর, নবযৌবন দূত, তাই ছেড়ে দিতে হবে স্থান।

বন্ধনহীন মেলামেশায় কখনোও থাকে ভালোবাসা, কখনোও বা ভালোবাসার অভিনয়ের মাধ্যমে উন্মাদনা লাভ। কারন অনেকেরই ভবিষ্যৎ অস্বচ্ছ।

গ্রামাঞ্চলে চাষবাসের উপর নির্ভরশীল প্রজন্মের পর প্রজন্ম আস্থাশীল। কিন্তু শহরাঞ্চলে কাজ কর্মের কোন স্থিরতা না থাকায় দিশাহীন ভবিষ্যত। যে কারনে সংসার বাঁধার ইচ্ছে রূপায়নের স্থিরতা না থাকায় উন্মাদনার মাধ্যমে সমাজে কর্মহীন বেকার যুবক-যুবতীরা ক্ষণিক উত্তেজনার মাধ্যমে

প্রেমের ক্ষতিপূরণ করে নেয়। যারা সচ্ছল পরিবারের সন্তান সংসার বাঁধার আগেই যতটা সম্ভব দেদার অর্থ বিলিয়ে, পছন্দমত বহু সঙ্গিনীর সান্নিধ্য লাভ করে, ফুর্তির স্বাদ গ্রহণ করে নিতে চায়।

এই মুক্তমন নারী পুরুষের সখ্যতা সময় বিশেষে শোভনতার মাত্রা অতিক্রম করে, তবুও আতিশয্যটা বাদ গেলে অবশিষ্টাংশ সেই সহজ, মুক্ত, সখ্য, সমাজের পক্ষে হয়তো ভালো হবে।

বর্তমান সমাজের ছেলেমেয়েদের এই অত্যধিক অনর্গল উদ্দাম মেলামেশাকে অপসংস্কৃতি হিসেবে আখ্যায়িত করলেও, ওরা হাজার উদাহরণ হাজির করছে মধ্যযুগ বা প্রাক 'অশোক' যুগ বা তারও আগের সংস্কৃতিকে উদাহরণ হিসেবে। এমন কি পুরাণ বা মহাকাব্যে ছড়িয়ে থাকা ভুরিভুরি উদাহরণকে।



উর্দু ভাষার ট্র্যাজেডি এবং হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ

- অ নু জ বি শ্বা স

এবিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে, উর্দু ভাষার জন্ম ও বিকাশ এই ভারতবর্ষের মাটিতেই হয়েছে। উর্দু আর হিন্দি ভাষা সংস্কৃতের যমজ উত্তরাধিকারী। ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম রাজ্য সুরসেন, তথা দিল্লী থেকে মথুরা পর্যন্ত যমুনার তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকেই সাধারণ মানুষের মধ্যে সৌরসেনী প্রাকৃত অপভ্রংশের ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। অনেকগুলি কথ্য ভাষার মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে তা হল কৌরবী উপভাষা। এই কৌরবী উপভাষা থেকেই কালক্রমে উর্দু ও হিন্দি ভাষার জন্ম। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়কালের মধ্যে সৌরসেনী কৌরবী প্রাকৃত এর

সাথে হরিনাভী, অবধী, ব্রজবুলি, ভোজপুরি, বুলেন্দী এবং নবাগত আরবী, ফার্সি ও তুর্কী ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় হিন্দুস্তানী ভাষা। এটি একটি মিশ্র ভাষা, আর্য্যাবর্তের মিশ্র রাজনৈতিক ও নৃতাত্ত্বিক সঙ্করায়নের ফসল। হিন্দুস্তানী ভাষার নিজস্ব কোন সর্বজনগ্রাহ্য বর্ণমালা নেই, এটি একান্তভাবেই হিন্দুস্তানের কথ্য ভাষা, মধ্যযুগীয় উত্তর ভারতের নতুন সংস্কৃতি।

হিন্দুস্তানী ভাষার প্রধান দুইটি লিখিত রূপ, একটি হল দেবনাগরী হরফে লিখিত হিন্দী এবং অপরটি নাসতালিক হরফে লিখিত উর্দু।

হিন্দী আর উর্দু যমজ ভাষা, তাই এদের শব্দভাণ্ডারের অর্ধেক শব্দই এক ও সমার্থক।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত হিন্দুস্তানী সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতায় সম্প্রীতির নিদর্শন হিসেবে গণ্য হলেও, সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে ইংরেজ সরকারের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি চালু হওয়ার সাথে সাথে উর্দু ভাষার জীবনে দুর্দশা নেমে আসে। হিন্দু-মুসলিম আলাদা করার সাথে সাথে সরকার বাহাদুর খুব সুনিপুণ ভাবে দ্বি-জাতি ও দ্বি- ভাষা তত্ত্ব (Two Nations and Two Languages Theory) একত্রে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেয়। ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণা

পত্রের মধ্যে অবধারিত দেশভাগের সাথে সাথে উর্দু ভাষার মৃত্যু পরোয়ানাও যে লুকিয়ে আছে তা বোধ করি স্বয়ং মির্জা গালিবও সেদিন বুঝতে পারেননি। ব্রিটিশ সরকার সমাজের উচ্চস্তরে এজেন্ট নিয়োগ করে। হিন্দু ব্রাহ্মণ এবং উর্দুভাষী এলিট মুসলিম সমাজকে নিয়োগ করা হয় ভাষা পরিশোধনের কাজে। কুলীন ব্রাহ্মণদের হিন্দি ভাষার সংস্কৃতায়নের কাজে লাগিয়ে, হিন্দি ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এটিকে কেবল হিন্দুদের ভাষা হিসাবে তুলে ধরা হয়। এ'থেকেই হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান তত্ত্বের জন্ম এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতি আজকের হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ। অপরদিকে উর্দু ভাষাকে স্থানীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করে ভাষার মধ্যে আরবী ও ফারসি শব্দ ভান্ডার ও বাকধারার প্রয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে এলিট মুসলিম সমাজকে ইংরেজরা যথেষ্ট তোল্লাই দেয়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সৈয়দ আহমেদ খানের নেতৃত্বে আলীগড় আন্দোলন ও পরবর্তীকালে খিলাফত আন্দোলন গড়ে ওঠে।

উর্দু ভাষা শোধন করতে গিয়ে তার সমাধির পথ প্রশস্ত হয়।

আরবী ও সংস্কৃত ভাষাকে খুড়োর কল বানিয়ে জাতিদাঙ্গা বাধিয়ে শুধু কোটি কোটি নিরপরাধ মানুষ খুন করাই নয়, এর সাথে হিন্দুস্তানী ভাষা ও সংস্কৃতিকেও খুন করেছে

ইংরেজ সরকার, আর সেগুলোর সংকার করে চলেছি আমরা, দেশের সাধারণ মানুষ।



১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সাফল্য বা ব্যর্থতা একটা জিনিস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, ভবিষ্যতে দেশভাগ অনিবার্য, নিদেনপক্ষে বাংলা আর আসাম প্রদেশের পুনর্বিভাজন অবধারিত। এরপরেই আসরে নেমে পড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি।

একে একে গঠিত হয় মুসলীম লীগ ও হিন্দু মহাসভা। দুইদল হাতে হাত মিলিয়ে খাল কেটে কুমির আনতে বেশী সময় নেয়নি।

দুই জাতির সাথে দুই ভাষাও সম্মুখ সমরে নেমে পড়ে। হিন্দু মহাসভার সাথে যোগ দেয় সঙ্ঘ পরিবার। হিন্দু রাষ্ট্র

ও জাতীয়তাবাদের আড়ালে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি প্রস্তর হয়। মহাসভার নেতারা হিন্দি ভাষার প্রতি এতটাই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে তারা তাদের মাতৃভাষাকে অগ্রাহ্য করতে দ্বিধা বোধ করেন না। আশ্চর্যজনকভাবে হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান তত্ত্বের যারা প্রবক্তা এবং ধারক ও বাহক, তাদের কারও মাতৃভাষা হিন্দী নয়। সাভারকরের মাতৃভাষা মারাঠী, মদনমোহন মালব্যের মালয়ী উপভাষা (ওনারা মধ্যভারতের মালয় অঞ্চলের আদি বাসিন্দা, মালয়- মালয়ী- মালভী- মালব্য)। লাজপত রাইয়ের মাতৃভাষা গুরুমুখী পাঞ্জাবি, তার বাবা ছিলেন উর্দুর শিক্ষক।

এছাড়া শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বা ডা. হেডগেওয়ার কারও মাতৃভাষা হিন্দী নয়, যথাক্রমে বাংলা ও মারাঠী। শুধু হিন্দুত্বের স্বার্থে তারা হিন্দি ভাষার দালালী করেছেন।

উল্টোদিকে পাকিস্তানের ধ্বজাধারী মুসলীম লীগ উর্দু ভাষাকে হাতিয়ার করে দুর্বার গতিতে এগোতে থাকে। এখানেও অদ্ভুত সমাপতন। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতাদের কারও মাতৃভাষা উর্দু নয়। জিন্নার মাতৃভাষা গুজরাটি আর তৃতীয় আগা খানের পারসি। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার নামে মাতৃভাষার এমন নির্লজ্জ বলিদান ভারতবর্ষ আগে কখনও দেখেনি। স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি

যেন তেন প্রকারে আমাদের উপর হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। আমরা মানে ভারতবর্ষের সেই সত্তর ভাগ, প্রায় আশি কোটি মানুষ যাদের মাতৃভাষা হিন্দি নয়। চল্লিশ কোটি মানুষের দায়ভার চাপিয়ে দেওয়া হল আশি কোটি মানুষের উপর। বর্তমানে শুধু চাপিয়ে দেওয়াই নয়, নাগপুরের গোপন এজেন্ডা অনুযায়ী একদেশ একজাতি একভাষা নীতি কার্যকরী করার জন্য হিন্দী বাধ্যতামূলক করতে চায় দিল্লির সরকার। ২৬/১১ পরবর্তী সময়ে ইসলামোফোবিয়ায় ভুগতে থাকা ভারতে উর্দু ভাষার গায়ে সুনিপুন ভাবে সন্ত্রাসবাদী দেশদ্রোহীর তকমা এঁটে দেওয়া হয়েছে। শাহীনবাগ আন্দোলনের পর উর্দু ভাষা আর টুকরো টুকরো গ্যাং সমার্থক বলে পার্লামেন্টে আওয়াজ তুলেছেন আমাদের মন্ত্রীবর। এরসাথে ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা জারি আছে। হিন্দি ভাষার ধ্বজাধারীরা ভুলে গেছে স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা সাহিত্যের যা ভূমিকা, উর্দু কবিতা আর শায়ারীর ভূমিকা তারচেয়ে কোনও অংশে কম নয়। এমনকি যে ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগান ব্রিটিশের মেরুদণ্ডে কম্পন ধরিয়ে দেয় সেটির উদ্গাতা ছিলেন উর্দু কবি মওলানা হাসরত মোহানি। এখানেও লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, বর্তমান ভারতে যে দুইজন মানুষ হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের পোস্টার বয়, তাদের কারও মাতৃভাষা হিন্দী নয়, তারা দুজনেই গুজরাটি বানিয়া।

ভারতে মত পাকিস্তানেও উর্দু ভাষার অবস্থা শোচনীয়। ১৯৪৮ সালে উর্দু ভাষাকে সেদেশের জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার সাথে সাথে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০% উর্দুভাষী, আর সেই ভাষাকেই দেশের জাতীয় ভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়া হল। উর্দু কোনোভাবেই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হতে পারে না, এটি ছিল মুসলীম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের একটা হাতিয়ার মাত্র। পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, খাইবার প্রদেশ এবং সমগ্র পূর্ব বাংলা জুড়ে উর্দু ভাষার লেশ মাত্র নেই। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের ৩০% মানুষ ছিল বাঙালী। বাকি ৬০% দখল করে আছে পাঞ্জাবি, পোস্তু, সিন্ধি এবং মুলতানি। পাকিস্তানে উর্দুভাষী মানুষের তুলনায় ভারতে উর্দুভাষী মানুষের সংখ্যা অন্তত তিনগুণ বেশি। বর্তমানে সেদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পাঞ্জাবি ভাষায় কথা বলেন। পাকিস্তানের মানুষ উর্দু ভাষাকে আজও হিন্দুস্তানের ভাষা মনে করে, তেমনি ভারতের কাছে পাকিস্তানি জঙ্গীদের ভাষা হল উর্দূ। ১৯৪৮ সালে বাঙলা ভাষা কে কেন্দ্র করে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা হয় তা সারা বিশ্বে ভাষা আন্দোলনের বিগ্রহ নড়িয়ে দেয়। বাঙলা আর উর্দু ভাষার সংঘাত চরমে ওঠে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। রক্ত দিয়ে রচিত হয় মাতৃভাষার বিজয়গাথা এবং বাঙালির আন্তর্জাতিক পরিচয় যার অনিবার্য পরিণতি হল ১৯৭১ সালের স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। রাজনৈতিক

মেরুকরণের খেলায় ধর্ম যদি তুরুপের তাস হয় তবে ভাষা হল ইস্কাবনের টেক্কা যাকে ধর্ম দিয়েও ওভার ট্রাম্প করা যায় না। তাই মহম্মদ আলি জিন্না, যিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি উর্দু ভাষা ও নাসতালিক বর্ণমালার বিন্দু বিসর্গও জানেন না এবং লাল লাজপতরাই দেবনাগরী বর্ণমালা ও হিন্দী ভাষা সম্পর্কে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন না করেও শুধু নিজেদের বিচ্ছিন্নতাবাদী ধর্মীয় রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করতে উর্দু আর হিন্দি ভাষার হয়ে ওকালতি শুরু করেন।

একথা অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই যে, সরকারী মদতে যেমন কোনও ভাষার বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব নয়, তেমনি রাষ্ট্রের চরম বিরোধীতা সত্ত্বেও কোনও ভাষা হারিয়ে যায়নি।

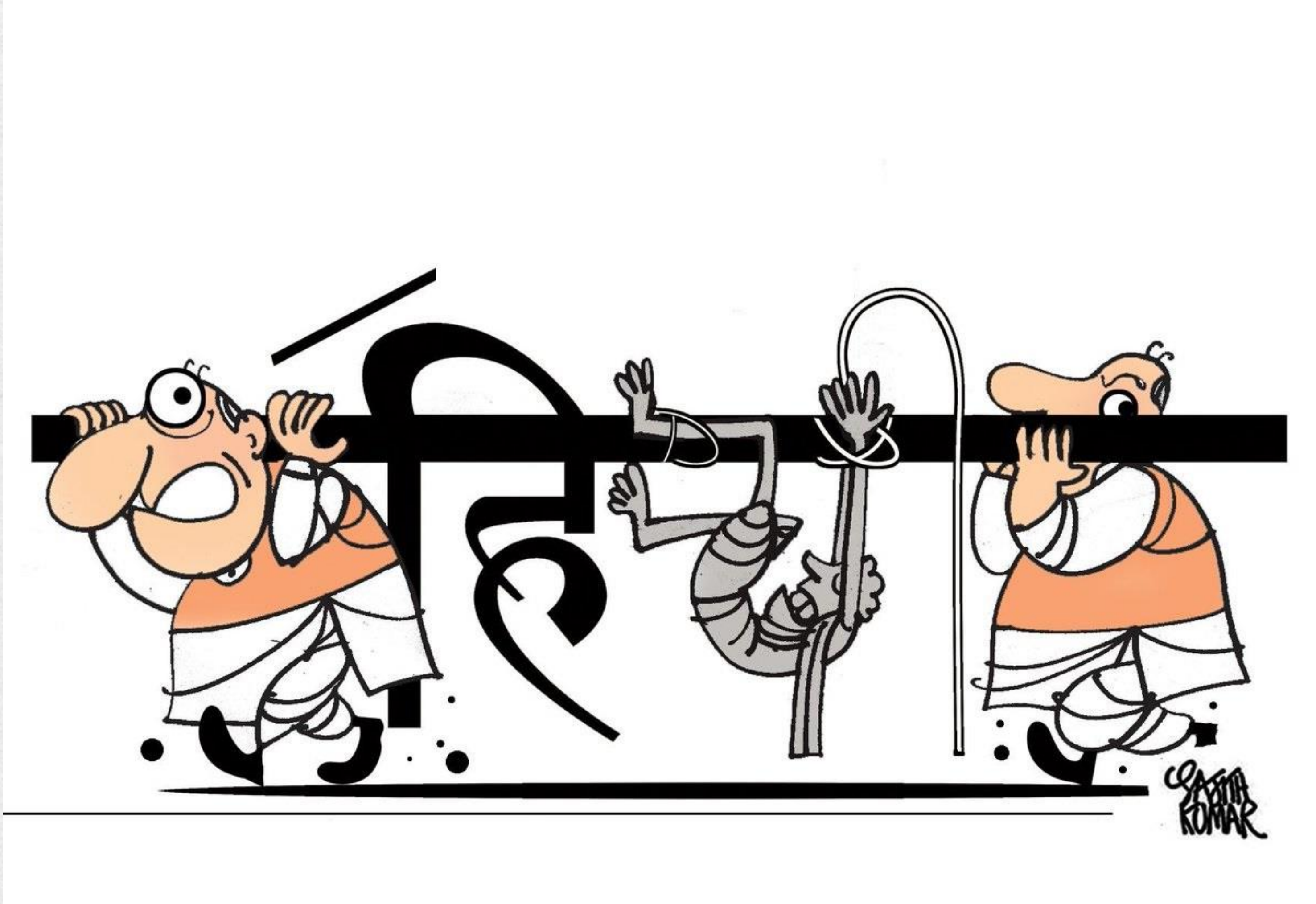
পাকিস্তানে উর্দু ভাষার একচ্ছত্র আধিপত্য করার মত ফাঁকা মাঠ থাকলেও আজ অবধি সমস্ত রকম সরকারী বদান্যতা সত্ত্বেও সেদেশে উর্দু ভাষার দুরবস্থা বেড়েছে বৈ কমেনি। আজ অবধি দ্বিতীয় কোনও গালিব, প্রেমচাঁদ, ইকবাল বা মন্টো কেউ উঠে আসেনি।

তেমনি ভারতের মাটিতে বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষা ক্রমশ লুপ্তপ্রায়। পরিবর্তে হিন্দী আর ইংরেজি ভাষার অবৈধ সহবাসের ফলে হিংলিশ নামক এক বর্ণসঙ্কর খিচুড়ি ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

রাষ্ট্রশক্তি যখন কোনও ভাষার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে তখন সমাজ নিজ দায়িত্বে সেই ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে চলে। ১৯৪৮ সালে জিন্না পূর্ব বাংলায় উর্দু ভাষা প্রতিষ্ঠা করার নিদান দেন, যার ফলশ্রুতি হিসাবে পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে গোটা পূর্ব পাকিস্তান লাহোরের হাতছাড়া হয়ে যায়। পারস্য দেশে ইসলামী শাসন চালু হওয়ার পর লাগাতার চারশত বছর ধরে আরব খলিফারা বুলডোজার চালিয়েও ইরানে আরবী ভাষায় প্রচলন ঘটাতে পারেনি। ইরানীরা আরবী ভাষায় কোরআন পাঠ করতে সম্মত হলেও দৈনন্দিন জীবনে এবং ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে পারসি ভাষা ছাড়া এক চুলও নড়েনি, নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তারা কোনও আপোস করেনি। এটি বিশ্বের ইতিহাসে দীর্ঘতম সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের অন্যতম উদাহরণ। বর্তমান ইরাকের কুর্দ জনজাতি হাজার অত্যাচার সহ্য করেও কুর্দিশ ভাষা ছাড়েনি, এমনকি স্বয়ং সাদ্দাম হোসেন কয়েক লক্ষ কুর্দ জনজাতি হত্যা করেও তাদের মধ্যে আরবী ভাষার প্রচলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৪৮ সালে জিন্না পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে একদেশ একভাষা নীতির পক্ষে সওয়াল করেন, যার মারাত্মক ফলাফল প্রত্যক্ষ করে পাকিস্তান আর কখনও ভাষা নিয়ে মাতব্বরি দেখানোর সাহস পায়নি।

ভাষা আন্দোলনের সামনে পাকিস্তান চরম শিক্ষা লাভ করলেও, ভারতবর্ষ এথেকে কোনও শিক্ষা নেয়নি।



সাংবিধানিক ভাবে ভারতের জাতীয় ভাষা না হওয়া সত্ত্বেও, সংবিধানের ৩৪৩ ধারায় হিন্দি আর ইংরেজি ভাষাকে একত্রে শুধুমাত্র সরকারী কাজ চালানোর ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরেও, হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে দ্রাবিড়ভূমে প্রথম গণ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ ভাষা আন্দোলনে নতুন

দিশা দেখিয়েছে। দিল্লীর হিন্দি শাসক পরাজয় স্বীকার করে ফিরে গেছে। ভারতবর্ষ বহুত্ববাদে বিশ্বাসী, নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানের দেশ। এখানে একদেশ একভাষা নীতি কখনই চলতে পারে না।

বারংবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও দিল্লির শাসক এই সহজ সত্যটিকে অস্বীকার করে এসেছে। হিন্দী কখনই ভারতের জাতীয় ভাষা হয়ে উঠতে পারে না।

সমগ্র দাক্ষিণাত্য ও উত্তরপূর্বে হিন্দী চলেনা। ভারতে প্রচলিত ২২৫টি দেশীয় ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা হিসাবে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক, অন্তত পঁচাত্তর কোটি মানুষ আজকের দিনে কমবেশি ইংরেজী জানেন। অর্থাৎ, অভিন্ন ন্যুনতম জ্ঞান বা Common Minimum Knowledge এর সূচকে মাপলে ভারতের সবচেয়ে বেশি মানুষ যে ভাষা জানেন সেটি হল ইংরেজি। একমাত্র ইংরেজি হওয়া উচিত ভারতের Lingua Franca, কিন্তু তা হওয়ার নয়। আর্য্যাবর্ত, পশ্চিম ভারত জয় করে হিন্দি ধ্বজাধারী দের চোখ পড়ল বাংলার দিকে। বছরের পর বছর ধরে পরিকল্পনা করে, গোবলয় থেকে হাজারে হাজারে হিন্দিভাষী মানুষকে বাঙলায় নিতে এসে, হিন্দু মুসলিমে আড়াআড়ি বিভাজন ঘটিয়ে, উত্তর প্রদেশ মডেলের সোনার পাথরবাটি

দেখিয়েও হিন্দী বর্গীর দল বঙ্গদূর্গের দরজা খুলতে পারলো না। বাংলার মানুষ রাজনৈতিক ভাবে হিন্দী অসুরের আক্রমণ ঠেকিয়ে দিল। এরাজ্যের মানুষ জানে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা কতখানি। বাঙালী মাতৃশক্তির পূজারী, পুরুষতান্ত্রিক অবতার তত্ত্বের পরোয়া করে না। বাঙলার কৃষ্টি সংস্কৃতি আক্রান্ত হলে রাম-আল্লাহ-যীশু কেউ বাঁচাতে আসবে না, বাঙালী নিজেই নিজেদের বাঁচাবে। হিন্দী আগ্রাসন গণতান্ত্রিক ভাবে প্রতিহত হয়েছে, এখন সময় হিন্দি ভাইরাস আর ইউপি মডেল থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার। বাংলার মানুষ একদিন বিলাতী পণ্য বয়কট করেছে, এবারে হিন্দী প্রলোভন বয়কট করবে।।

অনুজ বিশ্বাস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক বিভাগে কর্মরত।
ইমেল: anuj.biswas.dop@gmail.com



প্রসঙ্গ: বিজ্ঞানমনস্কতা

- রা জু দ ত্ত

বিজ্ঞানমনস্কতা বলতে আমি বুঝি, মনকে বিজ্ঞান নির্ভর করে তোলার প্রয়োজনে যুক্তিবাদী হয়ে ওঠা।

বিজ্ঞানমনস্ক হতে গেলে, তাকে প্রথাগত শিক্ষায় বিজ্ঞানের কোনো একটি বা একাধিক শাখায় পান্ডিত্য থাকতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এমনকি তিনি যদি প্রথাগত শিক্ষায় বিশেষভাবে শিক্ষিত নাও হয়ে থাকেন,

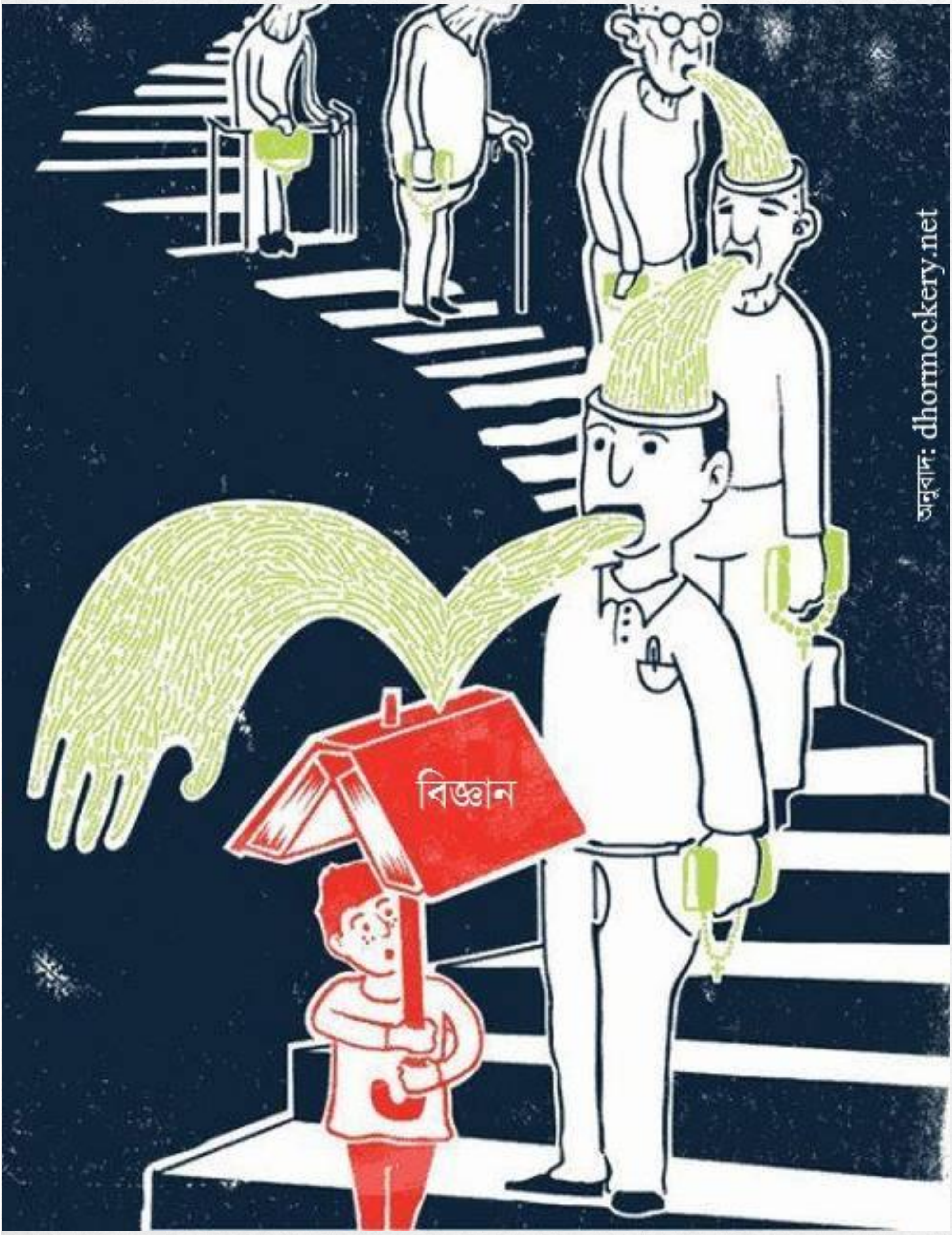
তাতেও তিনি বিজ্ঞানমনস্ক হবার ক্ষেত্রে অযোগ্য নন। বিজ্ঞানমনস্ক প্রথাগত শিক্ষা নির্ভর নয়।

কেউ যদি স্বেচ্ছায় নিজ উদ্যোগে বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং অর্জিত শিক্ষা তিনি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেন, তবে তাকে বিজ্ঞানমনস্ক বলা যেতে পারে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের এক বা একাধিক শাখায় প্রথাগত শিক্ষার এক বা একাধিক ডিগ্রি অর্জন করা সত্ত্বেও কেউ যদি, তার অর্জিত শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ না করেন, তবে তাকে কখনোই বিজ্ঞানমনস্ক বলা যাবে না। কাজেই বিজ্ঞানমনস্ক হতে হলে, কোনো ব্যক্তিকে প্রথাগত শিক্ষায় বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী অথবা প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান বিষয় শিক্ষকতা করতেই হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

তাহলে কি বিজ্ঞানমনস্ক হবার ক্ষেত্রে প্রথাগত শিক্ষার কোনো গুরুত্বই নেই? অবশ্যই আছে। তবে তা উল্লেখিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নির্ধারিত মুল্যয়নে নম্বর প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে না। তা নির্ভর করে অর্জিত বিজ্ঞান শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগের উপর। প্রথাগত শিক্ষায় বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করলে, একজন ব্যক্তির বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠার পথ

সুগম হয়। অন্যদিকে নিজ উদ্যোগে বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিষয়টা অপেক্ষাকৃত কঠিন। তবে অসম্ভব নয়। তাছাড়া প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত প্রত্যকে ব্যক্তি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে নির্ধারিত বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। তিনি সেইটুকু শিক্ষার ভিত্তিতে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠতে পারেন। প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান বিষয় উচ্চশিক্ষা লাভ না করেও।



একজন ব্যক্তির বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে তার পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের ভূমিকা অবশ্যই রয়েছে।

এই সকল পরিবেশ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাসী হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শৈশব থেকেই সেই সকল চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হন। তখন তার বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠা অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। তার মানে এই নয় যে সেই ব্যক্তির পক্ষে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠা অসম্ভব।

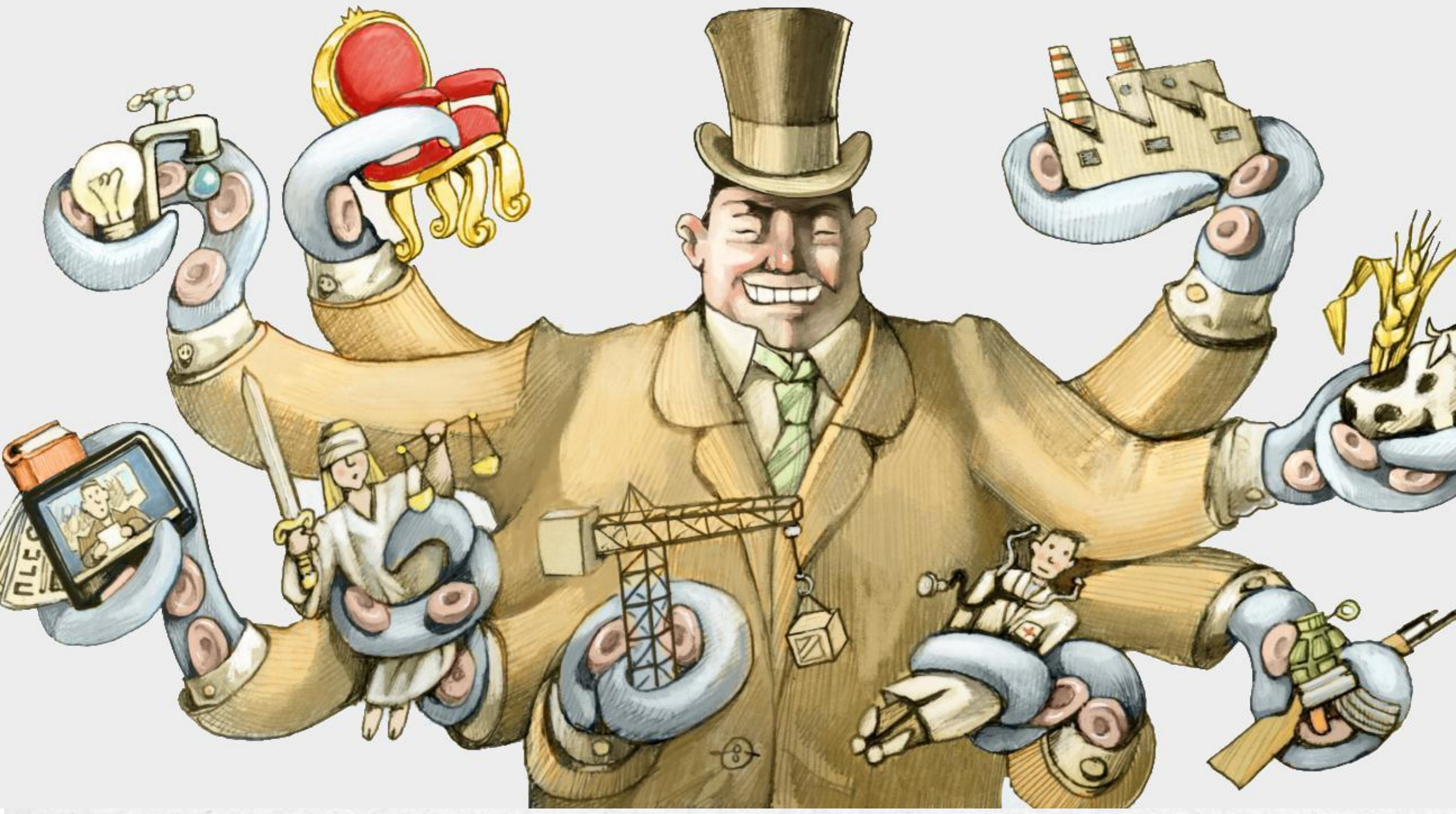
ভুলে গেলে চলবে না ইউরোপে রেনেসাঁ বা ভারতে নবজাগরণের পথিকৃৎ মহামানবেরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজেই বেড়ে উঠেছেন। সেই সমাজের মধ্যে থেকেই তাঁরা আমাদের প্রগতিশীলতার পথ দেখিয়েছেন। তাঁদের লড়াই আজকের তুলনায় সহস্রগুণ কঠিন ছিল। তবুও মানব কল্যানে তাঁরা আমৃত্যু আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তাঁরাই তো আমাদের প্রেরণা। তাঁরা যদি তীব্র প্রতিকুলতার মধ্যে থেকেও লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন, তবে আজ এত অনুকুল পরিবেশে আমরা কেন নিজেদের বিজ্ঞানমনস্ক করে

তোলার লড়াই, সমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লড়াইটা লড়তে পারবো না?

আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষায় সুশিক্ষিত হতে হবে। বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে সেই শিক্ষা। ছড়িয়ে দিতে হবে আমাদের অর্জিত শিক্ষা অপরের মধ্যে। তবেই আমরা পারবো কুসংস্কার মুক্ত এক সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে। যেখানে মানুষ বাঁচবে 'মানুষ' হয়ে।

"যে দেশের যুব সমাজ দেব-দেবী ও ধর্মের পেছনে দৌড়াতে থাকে, তাদের জন্য আমি কাপুরুষ শব্দ ব্যবহার করা উচিত মনে করি। তারা নিজের হাত পা চালাতে পারে না, তাই দেবদেবীর কাছে হাত পাতে। এই রকম যুব সমাজের হাতে দেশের ভার গেলে, সেখানে কিছুই ভালো হওয়া সম্ভব নয়।"

– শহীদ ভগৎ সিং



বিজ্ঞানের বিকাশ ও শোষণের প্রক্রিয়া বদল

- প্র বী র ব্যা না র্জি

সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামো পাল্টে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রবর্তনে বিজ্ঞানকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইউরোপে পঞ্চদশ - ষোড়শ শতকে নবজাগরণ (রেনেসাঁস) এবং ধর্মসংস্কার (রিফরমেশন) আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদী রূপান্তরের এই পর্বে পুঁজিবাদ সহায়তা করেছিল বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান পুঁজিবাদকে। সমাজ বলতে এখানে আর্থসামাজিক অবস্থাকে ধরা হচ্ছে।

কৃষিক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেল এবং আগেকার স্থানীয় চাহিদা নির্ভর যে উৎপাদন ব্যবস্থা তা বদলে গিয়ে কৃষিতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হলো। এই উদ্বৃত্ত উৎপাদন কেন্দ্র করে সামুদ্রিক বাণিজ্য বিকাশ ঘটলো।

অবশ্যই নৌ-পরিবহনে তা উদ্দীপনা প্রদান করলো। অর্থাৎ আগেকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বদল হবার জন্যই হাত পাততে হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাছে। কম্পাসের উদ্ভাবন নাবিকদের অকূল সমুদ্রে দিকনির্দেশ করতে সহায়তা করলো। আবিষ্কৃত হলো অ্যাস্ট্রোল্যাব যন্ত্র, যার সাহায্যে কোনো স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। পাশাপাশি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চর্চা আর্থসামাজিক প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। জলপথে সড়কপথের তুলনায় কম খরচে ও কম সময়ে অন্যত্র পৌঁছানোর সম্ভব হলো। ধাতু এবং কাঠ ব্যবহার করে জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে উন্নত করতে দ্বারস্থ হতে হলো আবার বিজ্ঞানের। সামাজিক প্রয়োজনে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটল। আবার অন্য ভাবে বললে বিজ্ঞানের বিকাশ সামাজিক পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলল।

নৌবাহিনীতে শক্তিনালী দেশ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে। এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য দেশ হলো স্পেন ও পর্তুগাল, পরবর্তীতে ইংল্যান্ড এবং হল্যান্ড। ফান্স ও জার্মানি তাদের আগের ক্ষমতা হারাতে থাকে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা নিচ্ছে।

আবার যুদ্ধে বারুদের ব্যবহার নির্ণায়ক হয়ে উঠলো। উদাহরণ - ১৪৮৫ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বসওয়ার্থের যুদ্ধ। বারুদের সাহায্যে যুদ্ধ জয়ের পর টিউডর রাজতন্ত্র

সূচনা হয়। মাত্র আটত্রিশ বছর পর ১৫২৬ এ পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন।

আবার এই বারুদ ও গুলির ক্ষত নিরাময়ের জন্যও বিজ্ঞানের ডাক পড়ল। অ্যামবোয়াজ পারে (Ambuois Pare) শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে অস্ত্রপচারের কৌশল দেখালেন। এর পাশাপাশি বিকাশ ঘটল শারীরতত্ত্ব (ফিজিওলজি) এবং বিকারতত্ত্ব (প্যাথোলজি)। শল্য চিকিৎসার বিকাশের স্বার্থে শরীরসংস্থানবিদ্যা (অ্যানাটমি)-র বিকাশের প্রয়োজন ছিল। উল্লেখযোগ্য নাম এই বিষয়ে বেলিলিয়াস, যিনি লিখলেন মানব শরীরের গঠন (De Humani Corpoloris Fabrica)।

জাঁ ফার্নের প্যাথোলজি সম্বন্ধে চর্চা করলেন। একইসঙ্গে রোগ নিরাময়ে এবং শিল্পকলা চর্চাকে এই জ্ঞান ভীষণ ভাবে সহায়তা করলো।

অ্যানাটমি রেনেসাঁস শিল্পীদের প্রভাবিত করে। শিল্পীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির বিকাশ ঘটে। এর জন্য শিল্পীরা আলবের্তীর কাছে ঋণী। যিনি বলেছিলেন মানবদেহের স্তরভেদে আঁকা উচিত; অর্থাৎ প্রথমে অস্থির কাঠামো আর শেষে চর্ম আবরণ, মাঝে পেশিকলা, শিরা-ধমনী ইত্যাদি। এই বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটার ফলে সমৃদ্ধ হলো শিল্প। আর্নল্ড

হসারের লেখা বই Social History of art এ প্রকাশ পায়, জ্যামিতি, গণিত, বলবিদ্যা, আলোকবিজ্ঞান ইত্যাদি হলো এই শিল্পকলার নানান উপাদান।

রেনেসাঁস শিল্পীরা একাধারে শিল্পী আরেক দিকে কেউ কেউ বিজ্ঞানেও বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় লিওনার্দো দা ভিঞ্চি আলোকবিদ্যা, শরীরসংস্থানবিদ্যা, প্রাণীকূল, গাছপালা, শিলাপাহাড় প্রভৃতি



নানা বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। তিনি ছিলেন এ যুগের এক সার্থক প্রতিনিধি।

আরেকটা মাইলফলক বিজ্ঞানের পক্ষে গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র। বই ও কাগজপত্রের মাধ্যমে ছাপার অক্ষরে জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ ঘটল। বুর্জোয়াদের আগ্রহ বাড়ল শিল্পকলা, ভ্রমণ ও ভূগোল বিষয়ক লেখাপত্তরে।

এতদিনের ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার বদলে চর্চা শুরু হলো মানবতাবাদী শিক্ষার যার হাত ধরে উঠে এলো নতুন চিন্তক শ্রেনী, যাদের বলা হতো মানবতাবাদী বা হিউম্যানিস্ট।

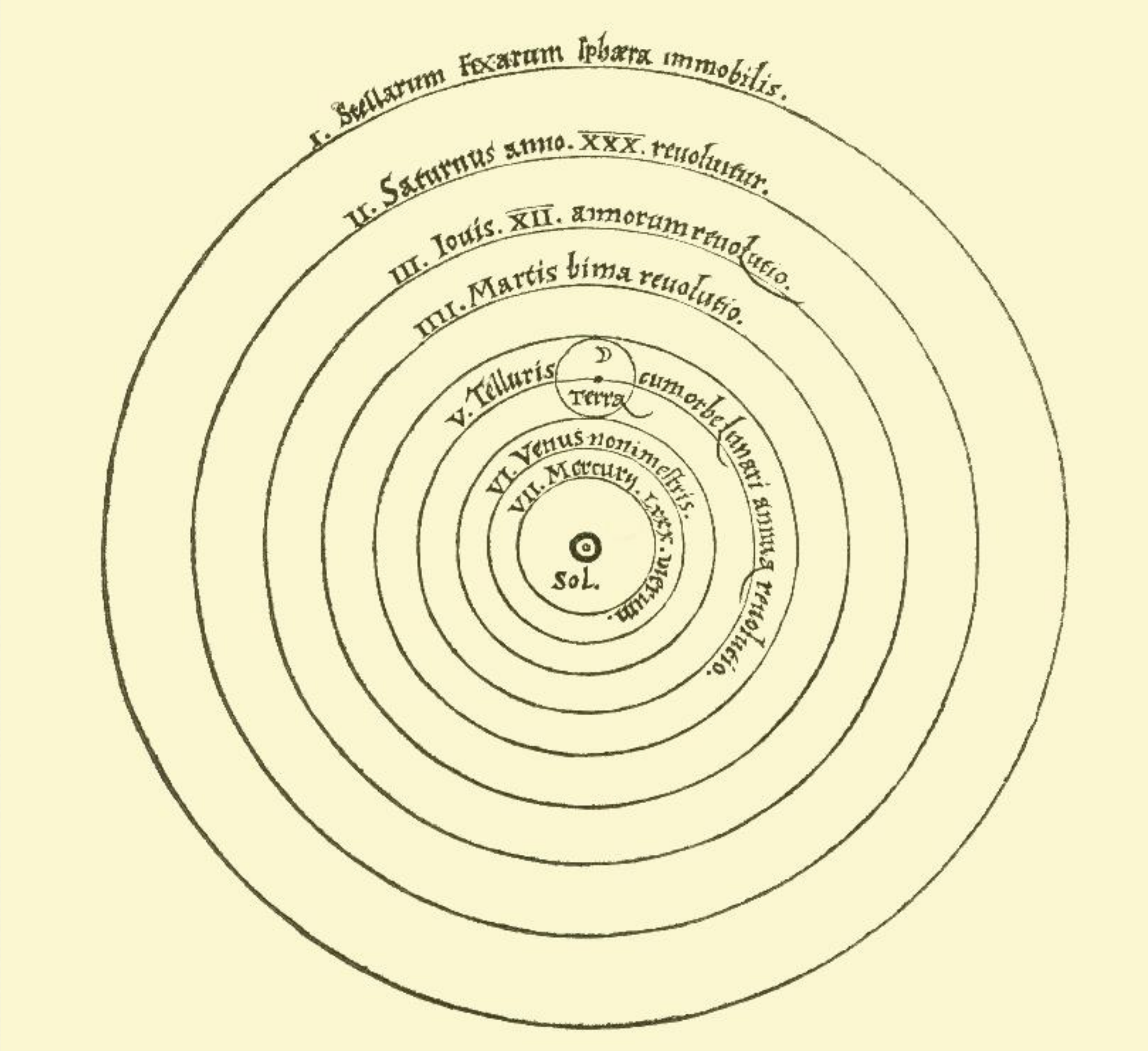
এদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষ। বিনা প্রশ্নের মেনে নেওয়ার বদলে জন্ম হলো জিজ্ঞাসার।

ক্যাথলিক চার্চের বাইবেল ছিল সাধারণের দুর্বোধ্য (আমাদের সংস্কৃতের মতো) ল্যাটিন ভাষায়। মার্টিন লুথার জার্মান ভাষায় এর অনুবাদ ছাপালেন। বাইবেল আর সাধারণের নাগালের বাইরে রইলো না। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের ভাষায় এর অনুবাদ ছাপালেন। চার্চের কর্তৃত্ব খর্ব হতে লাগল।অর্থাৎ বলা যায় যে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিগত অগ্রগতিই সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন (রিফরমেশন) বিকাশকে সম্ভব করে তুলল।



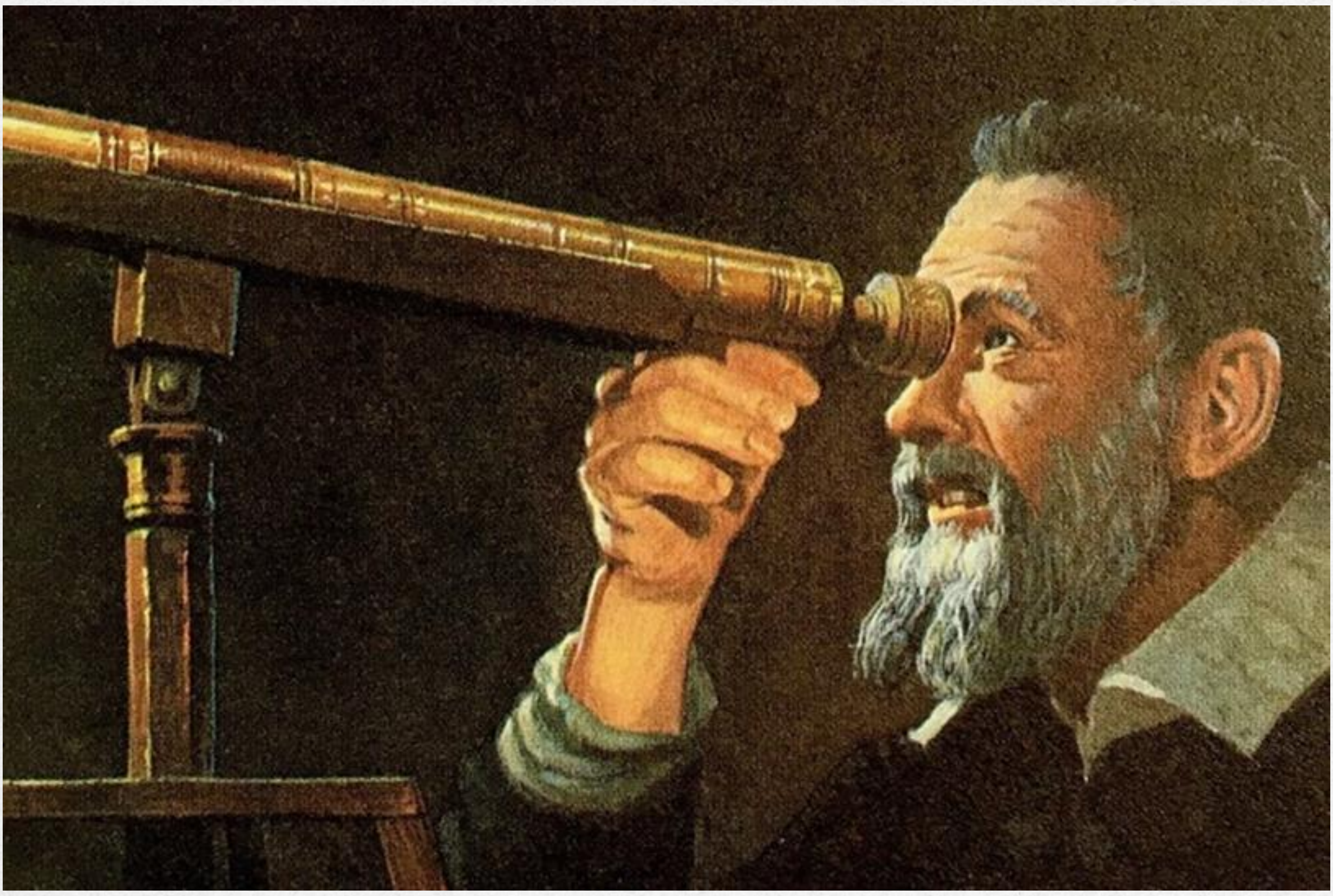
এবার বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সংঘাত অন্য বিষয়ে শুরু হলো। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কিভাবে গঠিত এই বিষয়ে প্রাচীন ধারণার সাথে নব্য আধারিত জ্ঞানের। টলেমি এবং অ্যারিস্টটলের ভূ-কেন্দ্রীয় মতবাদ বনাম ব্রুনো/কোপারনিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ। ততদিনে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়ে গেছে।নিকোলো

কোপার্নিকাশ দেখালেন পৃথিবী তার নিজ অক্ষকে ঘিরে সূর্যের চারপাশে পাক খাচ্ছে। চার্চের মত ছিল ঈশ্বর পৃথিবীর জন্মদাতা, তাই পৃথিবী বিশ্ব ব্যবস্থার কেন্দ্রে আসীন। তাকে কেন্দ্র করে গ্রহ ও নক্ষত্র ঘুরছে।বিতর্ক শুরু হলো। যদিও কোপার্নিকাশ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি। সেগুলো সমাধান করলেন কেপলার, টইকো ব্রাহে, গ্যালিলিও প্রমুখেরা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এই মতবাদ আসলে চার্চ আর বাইবেলের অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।এককথায় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান স্পৃহা সামাজিক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করলো।



আবার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে বিজ্ঞানের বিকাশ অনেকাংশে সাহায্য করল।পুঁজিবাদের বিকাশ বিজ্ঞানের

হাত ধরে উঠে এলো। খনি শিল্প, ধাতুবিদ্যায় এবং রাসায়নিক শিল্পের ক্রোমোন্নতি, পুঁজি বিনিয়োগ ও বিকাশের সহায়ক হয়ে উঠলো। খনিজ গবেষণা রসায়নের বিকাশকে ত্বরান্বিত করলো। রসায়নের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ডে রে মেটালিকা(De Re Metallica)। নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কার হলো।অর্থাৎ বিজ্ঞান চর্চার লক্ষ্য হলো সামাজিক চাহিদা পূরণ।



সামরিক প্রযুক্তি, মুদ্রণ ব্যবস্থা, ভৌগলিক অভিযানের সহায়ক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন যেমন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অনেকাংশে পরিবর্তিত করেছিল, তেমনি বিশ্ববীক্ষণকেও বদলে ছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদির অগ্রগতি সামগ্রিকভাবে সামাজিক উৎকর্ষ সাধন করেছিল। এই পুরো বিষয়টি ছিল দ্বিমুখী। একদিকে যেমন বিজ্ঞান সমাজকে প্রভাবিত করেছিল, অন্যদিকে আবার সামাজিক প্রয়োজনেই বিজ্ঞানের বিকাশ

সম্ভব হয়েছিল। আর এই প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান ব্যবহৃত হয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির বিকাশে এবং পুঁজিবাদের উত্থানে।

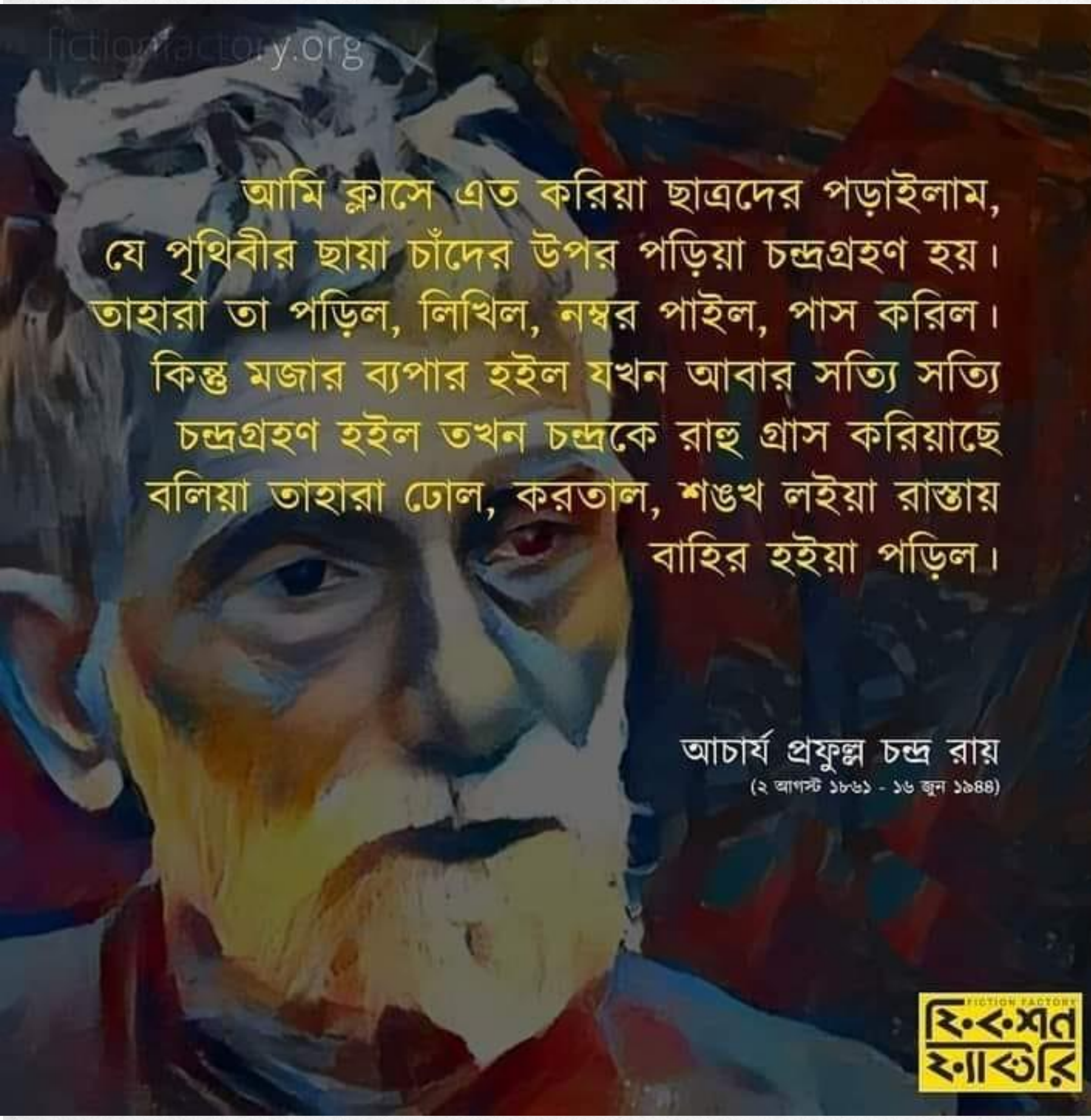
কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

ঔপনিবেশিক ভারতে বিজ্ঞান

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

সুজিত রাজবংশী





কৃপাদৃষ্টি

- সুমন কর্মকার

বেলা আন্দাজ দুপুর বারোটা। রাজ্যের শাসক দলের এক মন্ত্রীর অফিস। মন্ত্রী নেই। তার জেলারই আরেক বিধায়কের অফিসে তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে বেশ কিছু কন্ট্র্যাক্টচ্যুয়াল কাজের প্রার্থীদের তালিকা। হাজার হাজার প্রার্থীদের মধ্যে থেকে যোগ্য মানুষদের খুঁজে নেওয়াই এই মিটিংয়ের উদ্দেশ্য। যোগ্যতার যেসব মাপকাঠি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল টাকা। তাই দরদাম চলছে। ঠিক কত লাখ টাকায় ছেলেমেয়েগুলোর ভবিষ্যৎ লিখে দেওয়া যায় তার খসড়া প্রস্তুত হচ্ছে। ওরা মিটিং করুক। আমরা বরং ফিরে আসি মন্ত্রীর অফিসে। মন্ত্রী নেই। তাই মন্ত্রীর চেয়ার আলো করে বসে আছেন মন্ত্রীর পতিদেব। সাথে রয়েছেন মন্ত্রীর বিশ্বস্ত পিএ। ইনি স্বামী স্ত্রী দুজনেরই অত্যন্ত অনুগত।

হঠাৎ 'দাদা আসছি' বলে কেবিনে প্রবেশ করলেন পার্টির একজন বিশিষ্ট কর্মী। এই কেবিনে সবার আসার অনুমতি নেই। বেশীরভাগ পার্টি কর্মীই ছড়িয়ে ছিটিয়ে কেবিনের বাইরেই বসে থাকেন। দাদা বা বৌদি ডাকলে ভেতরে যান। তবে এনার ব্যাপারটা আলাদা। এর হাত ধরে কেও এসেছেন অথচ চাকরি হয়নি, এমন উদাহরণ বিরল। ইনি ঠিক 'যোগ্য' চাকরিপ্রার্থীদেরই বাছাই করে নিয়ে আসেন। যারা সবদিক থেকে 'যোগ্য'। তাই মন্ত্রী এবং মন্ত্রীর স্বামীর কৃপাদৃষ্টি রয়েছে এনার ওপর।

দাদা- হ্যাঁ বল, কেমন আছ? আজকাল তো দেখাই পাওয়া যায়না তোমার।

বিশিষ্ট কর্মী- আরে দাদা কি যে বলেন? এই আপনাদের আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে আর কি। আজ দাদা আমাদের এলাকার দুজন মহিলা কর্মীকে এনেছি। দারুণ কাজ করে দাদা। এলাকায় সংগঠন এদের হাত ধরে অনেক মজবুত হয়েছে। ওই আইসিডিএস না কিসে কয়েকটা চাকরি বেরিয়েছে না? তো সে খবর পেয়েই এরা আমার কাছে এসেছিল। আমি বললাম আমাকে বলে কি হবে? মাথার ওপর দাদা আছেন। ওনাকেই সরাসরি বল। আমি টাকা-পয়সার কথা সব বলে দিয়েছি দাদা। আপনি বাকি কথা বলে নিন।

দাদা- ওহ এতোদিন কাজ করছ এখনও তোমায় শেখাতে পারলাম না। এসব কথা এতো চেঁচিয়ে বলার কি আছে? বাইরে কতজন এই এক আবেদন নিয়ে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে জানো? কয়েকজন তো সেই নোটিস বেরোনোর দিন থেকে আসছে আর ফিরে যাচ্ছে। বসো। একটু থিতু হও। এই তোমরাও বসো।

মহিলা দুজন বসলেন। এদের একজনের সদ্য ডিভোর্স হয়েছে। ছেলের বয়স ছয় বছর। স্বামী কাজকর্ম তেমন কিছুই করতেন না। তাই বিচ্ছেদের সময় ক্লেম করেও কোনোরকম খোরপোষ পাওয়া যায়নি। বাড়ির অবস্থা মাঝারি। তাই একটা চাকরি পাওয়ার আশায় ভিড়েছেন শাসকদলে। দ্বিতীয়জনের বাড়ির অবস্থা একেবারেই খারাপ। বাড়ির একমাত্র মেয়ে। বাবা মায়ের অনেক আশা মেয়ে পড়াশোনা করে চাকরি করবে। বাড়ির দুঃখ ঘোচাবে। মেয়ে জানতো চাকরির বাজারের অবস্থা তাই কলেজে পড়তে পড়তেই শাসক দলের ছাত্র সংগঠন করত। গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে তিন তিনটে বছর এলাকার নেতাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে। সবশেষে আজ একটা সুযোগ এসেছে।

দাদা এবার মেয়েদের উদ্দেশ্যে বললেন, দেখো জগন্নাথ যখন তোমাদের এনেছে তখন নতুন করে বলার আর কিছুই নেই। তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো।

অবিবাহিতা মেয়েটি খানিক লাজুক প্রকৃতির। সে চুপ করেই রইলো।

তুলনায় ডিভোর্সি মহিলা খানিক সাহসী। তিনি বললেন, 'দাদা, বারো হাজার টাকার কাজের জন্য পাঁচ লাখ একটু বেশি হয়ে যাচ্ছেনা?'

দাদা একটু হেসে বললেন, 'আরে! তুমি বেতনটা দেখছ কেন? ওতে তো তোমায় হাতই দিতে হবেনা। ষাট বছর অবধি চাকরি করবে। দুহাতে কামাবে। উপরি যা পাবে, তাতেই তোমার চলে যাবে। আর তুমি কি ভাবছ ওই টাকা আমি একা নেব? আরও কত জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে জানো? জগন্নাথ আমাদের নিজেদের লোক। তাই তোমাদের এতো কথা বলছি। নাহলে টাকা দেওয়ার লোকের তো অভাব নেই। যাই হোক টাকা নিয়ে রবিবার বিকেল নাগাদ আমার বাগানবাড়িতে পৌঁছে যাবে। তারপর বেশ ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তাকিয়ে বললেন একসাথেই আবার দুজন চলে এসোনা যেন। এই সপ্তাহে তুমি এসো। সামনের সপ্তাহে ওকে পাঠিয়ে দিও।'

ইঙ্গিত বুঝতে পেরে দুজনের মুখ ততক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে। ডিভোর্সি মহিলাটিই প্রথমে মুখ খুললেন, 'এ কি বলছেন দাদা? আমরা কোথাও যেতে পারব না। টাকা আমরা জগন্নাথদার হাতে দিয়ে দেব। সেরকমই তো উনি

বললেন। দাদার মাথা গরম হয়ে উঠেছে। জগন্নাথকে আর তুমি তুমি না করে সরাসরি তুইয়ে নেমে এলেন, 'কি রে তুই এদের বলে আনিসনি? শুধু টাকা দিলে চাকরি হয়?' জগন্নাথের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'না মানে স্যার লাস্ট দু'বার তো আপনি ছিলেন না। ম্যাডাম ডিল করেছিলেন, তাই ব্যপারটা মাথায় ছিল না আরকি'।

দাদা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমরা এখন এসো। পরে কথা হবে।'

এর ঠিক বছরখানেক পরের কথা। ডিভোর্সি মহিলাটি ছেলেকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে এসেছেন পাশের গ্রামের একমাত্র ডাক্তারবাবুর চেম্বারে। পেশেন্টদের লম্বা লাইন। হঠাৎ সেই লাইনে দেখতে পেলেন সেই অবিবাহিতা মেয়েটিকে, 'আরে তুমি! কতদিন পরে দেখলাম তোমায়। কেমন আছ? এখানে কেন? শরীর খারাপ নাকি? ' অবিবাহিতা মেয়েটি স্মিত হেসে বললেন, ‘এই দেখো না কাশিটা সারছেই না। তার সাথে আবার গলাব্যথা। তুমি কেমন আছ? কি করছ এখন?’

ডিভোর্সি মহিলা- এই চলে যাচ্ছে ভাই। করব আর কি? এই ছেলে মানুষ করছি। আর মাঝে মাঝে বাবার দোকানে বসি। তুমি কি এখনও পরীক্ষা দিচ্ছ?

অবিবাহিতা- দিচ্ছিলাম, শেষে ওই আইসিডিএস এর কাজটা পেলাম। গত মাসেই জয়েন করেছি।

ডিভোর্সি মহিলা- ওই কাজটা? কিন্তু কিভাবে? আমি তো জানতাম ওই অসভ্য ছোটোলোকটার হাত ছাড়া ওই চাকরি কোনোভাবেই হতে পারে না।

অবিবাহিতা- আমায় আর কিছু জিজ্ঞেস করনা, দিদি। আমি বলতে পারবনা। শুধু বলব তোমার মতো সাহস সবার থাকেনা গো। কাওকে কাওকে আপোষ করতে হয়। তবে জানোতো সেদিন ওই জানোয়ারটার অফিসে থুথু ছিটিয়ে আমিও বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সেই সাহস ধরে রাখতে পারলাম কৈ? আমি হেরে গেলাম দিদি। তাই আমায় আপোষ করে যেতে হবে বাকিটা জীবন। চাকরিটা ছেড়ে দিলেও আমার নিস্তার নেই। তুমি ভাল আছো দিদি, ভালো থেকো।

এই অবধি বলে ডিভোর্সি মহিলাটির অবাক দৃষ্টির সামনে দিয়ে মেয়েটা ডাক্তার না দেখিয়েই চেম্বার থেকে বেরিয়ে পড়লো। ডিভোর্সি মহিলাটি ছেলেকে আরও খানিকটা আঁকড়ে ধরলেন।



বস্তুর চেতনাসঞ্চার

- ত ন্ম য়

বস্তু থেকে চেতনার সৃষ্টি না চেতনা থেকে বস্তুর - এই নিয়ে বিতর্ক বহুদিনের। লোকায়ত মতে চেতনা দেহেরই গুন,দেহের বাইরে চেতনার অস্তিত্ব নেই। ভাববাদীরা এক্ষেত্রে প্রশ্ন তুলেছেন চেতনা যদি দেহেরই গুন হয় তবে মৃত দেহও তো দেহ তাহলে সেই দেহে তো চেতনা নেই অতএব চেতনা দেহের গুণ নয়, চেতনা দেহাতিরিক্ত শক্তি যা মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় থেকেই ছিল এবং এই চেতনা থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে চেতনা থেকে বস্তু সৃষ্টির ধারণাটাই প্রতিষ্ঠিত করতে হয়।

চেতনা যদি বস্তুর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ভিন্ন সত্তা না হয় তবে তো চৈতন্যময় ঈশ্বরের ধারনাই অমূলক হয়ে যায়।

কিন্তু চেতনা থেকে যদি সকলপ্রকার বস্তুর সৃষ্টি হয় তবে তো মহাবিশ্বের সমস্ত শক্তি বা বস্তুর মধ্যেই চেতনার অস্তিত্ব থাকবে, সেই চেতনা যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন? মাটি থেকে কোনও কিছুর সৃষ্টি হলে মাটির সামান্যতম উপস্থিতি থাকবে না? সেটা কি সম্ভব? না,সম্ভব নয়। সৃষ্টির মূল উপাদানকরণ থেকে সৃষ্ট প্রত্যেকটির বস্তুর মধ্যেই সেই প্রাথমিক উপাদান পরিলক্ষিত হবে, এটাই বাস্তব। সৃষ্টির আদিতে চৈতন্যের উপস্থিতি অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ চরম বা পরম সত্তার অনুসারীরা বলেন, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই চেতনা বর্তমান। সেই চেতনা ব্যক্ত হয়নি, অব্যক্ত অবস্থায় আছে।এই চেতনার মান শূন্য। এই শূন্য কোনও সংখ্যাহীনতা নয়, তাই চেতনাহীন নয়।

অদ্ভুত এই দাবী। চেতনার মান যদিই শূন্যই হয় তবে চেতনার অস্তিত্ব থাকতে পারে কি? শূন্য এককভাবে কোনও কিছুর অস্তিত্বহীনতাই বোঝায়। আরবি শব্দ “সাফাইর” বা “সাফাইরা” শব্দের পরিবর্তিত রূপ হল ইংরেজির “শূন্য”। “সাফাইর” বা “সাফাইরা” শব্দের অর্থ “সেখানে কিছু ছিল

না"। সংস্কৃত শব্দ "শুণ্যেয়া"র অর্থ "খালি" বা "ফাঁকা"। তাহলে কি দাঁড়াল? দাঁড়াল এই যে চেতনার মান শূন্য কথাটার অর্থ চেতনার অস্তিত্বহীনতা।

বস্তুবাদী মতানুসারে দেহ গঠনের মূল উপাদানগুলির মধ্যে চেতনার অস্তিত্ব থাকে না। উপাদানগুলির প্রত্যেকটাই নিস্প্রাণ, জড় অর্থাৎ অচেতন। কিন্তু এই জড় পদার্থের যখন বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয় তখন এক নতুন গুণ বা ধর্মের উদ্ভব হয়, ইহাই চেতনা। উদাহরণ হিসেবে বস্তুবাদীরা মদশক্তির কথা উল্লেখ করেন। যে সকল দ্রব্যের মিশ্রণে মদ তৈরি হয়, সেইসকল দ্রব্যের একটির মধ্যেও স্বতন্ত্রভাবে সেই শক্তি নেই নেই যে শক্তি মদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ মদ পান করলে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় সেই উত্তেজনা মদ তৈরির উপকরণগুলি পৃথক পৃথকভাবে বা একত্রে খেলেও সৃষ্টি হবে না। কিন্তু সেই উপকরণগুলিকে যখন বিশেষ তাপমাত্রায় বিশেষভাবে (অর্থাৎ উপকরণগুলির পরিমাণের বিজ্ঞানসম্মত অনুপাতে) মিশ্রিত করা হয় তখন যে তরল পানীয়ের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে এক নতুন গুণের সৃষ্টি হয়, সেটাই মদশক্তি।

এই মদশক্তিকে উদাহরণ ধরেই বলা যায়, যে সকল জড়বস্তুর সমন্বয়ে শরীরের গড়ে ওঠা সেইসকল জড়বস্তুর

মধ্যে স্বতন্ত্র বা মিলিত অবস্থায় চেতনার কোন লক্ষণ না থাকলেও সেগুলিরই কোন এক বিশেষ পরিবর্তনের ফলস্বরুপ উদ্ভব ঘটেছে চেতনা নামক এক সম্পূর্ণ নতুন গুণের।

এই গুণের অস্তিত্ব দেহ বা শরীর ছাড়া সম্ভব নয়। বস্তু ও চেতনা গুনগতভাবে বিপরীত ধর্মী, কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। বস্তুর অস্তিত্ব ব্যতীত চেতনার অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

তাই বিপরীত ধর্মী হলেও বস্তু ও চেতনার মধ্যে একটা ঐক্যও বর্তমান। এটাই বৈপীরিত্যের ঐক্য।

এখানে একটা প্রশ্ন জাগে যে বস্তু ও চেতনার মধ্যে ঐক্য থাকলে তো সকল বস্তুর মধ্যে চেতনা বর্তমানের ধারণাটা মান্যতা পেয়ে যায়? এই প্রশ্নের উত্তর হবে যে বস্তুর অস্তিত্ব ব্যতীত চেতনার অস্তিত্ব থাকতে পারে না কিন্তু অবশ্যই চেতনার অস্তিত্ব ব্যতীত বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে। তাহলে আর ঐক্য হল কোথায়? এখানে বস্তু বলতে সকল প্রকার বস্তুর কথা ভেবে নিলে অযৌক্তিক হবে। এখানে বস্তু বলতে ক্রম সমন্বয়ী বস্তুর ভিত্তিতে গড়া দেহ বা শরীরের কথা ধরতে হবে।

এত আলোচনা সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠতে পারে, চেতনা যদি শুধুমাত্র দেহের গুণ হয় তাহলে মৃতদেহে চৈতন্য বর্তমান থাকে না কেন? ভাববাদীরা দেহ বলতে জড়দেহ ভেবে নিয়েছেন। মৃতদেহ যেহেতু জড়দেহ তাই সেই দেহতে স্বাভাবিকভাবে চেতনার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। দেহ মাত্রেই অনুভব বা চিন্তা করতে সক্ষম নয়। যেহেতু জৈব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চেতনার উদ্ভব হয়েছে সেহেতু কেবলমাত্র জৈবিক জীবিত দেহই এই গুণসম্পন্ন হয়। যে দেহে প্রাণ বর্তমান সেই দেহ জীবিত, মৃতদেহে প্রাণ বর্তমান থাকে না তাই মৃতদেহে চেতনার অস্তিত্ব খোঁজা অবাস্তব।

প্রশ্ন উঠতে পারে, উদ্ভিদেরও তো প্রান আছে, তাহলে কি উদ্ভিদেরও চেতনা আছে? হ্যা,আছে তবে উদ্ভিদের চেতনা আর প্রাণীর চেতনার মধ্যে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য হল অনুভূতি ও প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সাথে চিন্তার পার্থক্য।উদ্ভিদের চেতনা হরমোন দ্বারা নির্ধারিত হয় বলে উদ্ভিদ শুধুমাত্র অনুভূতির মাধ্যমে ও প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় সাড়া দিতে পারে কিন্তু যেহেতু উদ্ভিদের স্নায়ুকোষ নেই তাই চিন্তা করতে পারে না।

বিবর্তনের ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক বস্তুগত বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে বস্তু থেকে চেতনার উদ্ভবের কার্যকারন সম্পর্কের ব্যাখ্যা অবৈজ্ঞানিক। গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা হল

বস্তুর ধর্ম। অনুন্নত থেকে উন্নত, সরল থেকে জটিল ক্রমে বিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়েই বস্তুর রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত পরিমান স্বরূপ চেতনার উদ্ভব। বস্তুর বিকাশ ব্যতীত চেতনার সৃষ্টির দাবী অযৌক্তিক।

চেতনার উৎস সম্পর্কে চেতনা বিষয়ক এবং জীব বিজ্ঞানীদের কয়েকটি ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক, "All three media-genetic evolution, phenotypic plasticity and memetic evolution-have contributed to the design at human consciousness, each in turn, and at increasing rates of speed". (ডেন্নেট,আমেরিকার চেতনা বিষয়ক বিজ্ঞানী)

"Convert attention is the virtual movement of deep processing from one item o another. The cortex needs to control that virtual movement … is does so by constructing an attention schema- a constantly updated set of information that describes what convert attention is doing moment by moment-by moment and what its consequences are". (বিজ্ঞানী গ্রাজিয়ান)

“It is quite certain that human consciousness did not arise fullfledged with the human species, but is only the most highly evolved end point of a long evolutionary history”. (আরনেস্ট মেয়ার, জার্মান জীববিদ)।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাসমুহের (সাম্য ও বিপর্যয়) থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ অভিযোজিত বা সৃষ্টি সম্বন্ধীয় পরিব্যক্তির মাধ্যমে চেতনার সৃষ্টি হয়। অনেকে বলেন, বিবর্তনের দীর্ঘ পরিক্রমায় উপজাত বস্তু (বাই প্রোডাক্ট অফ এভলিউশন) রূপে চেতনাকে পাওয়া যায়।

সকল আলোচনা বিশ্লেষণ করে আমরা বস্তু থেকে চেতনার উৎপত্তির যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যাটি হাজির করতে পারি তা হল, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বস্তুজগতের গুনের পরিমানগত বৃদ্ধি গুণাত্মক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকাশের স্তরের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে এক নতুন গুণসম্পন্ন বস্তুর সৃষ্টি করে যার মধ্যে চেতনা পরিলক্ষিত হয়।এরূপ ক্ষেত্রে অজড় বস্তুতে উত্তরণের মধ্য দিয়ে জড় বস্তুটির নিরাকরণ ঘটে।

বিখ্যাত দার্শনিক এঙ্গেলসের উক্তি দিয়ে এই অধ্যায়ের শেষ করি, তিনি বলেছেন - "আমরা যে প্রত্যক্ষ বস্তুজগতের অন্তর্গত তাই একমাত্র বাস্তব। আমাদের চিন্তা বা চেতনাকে যতই ইন্দ্রিয়াতীত বলে মনে হোক না কেন, তাহা আসলে একটি বস্তুময় দৈহিক অঙ্গ মস্তিষ্কেরই উপপাদ। বস্তু চেতনার উপপাদ নয়, চেতনা নিজেই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপপাদমাত্র"।

"ধর্ম গভীর মানবিক নৈতিকতা বোঝে না, বোঝে কতকগুলো মোটা দাগের আদেশ পালনের নৈতিকতা।"

- হুমায়ুন আজাদ



শব্দ দূষণ

-দি বা ক র ম ন্ড ল

প্রতি বছরই রুটিন মাফিক মনসা পুজো থেকে শুরু করে দুর্গাপুজা, কালীপুজা এবং আরো অন্যান্য সমস্ত রকম ধর্মীয় পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠানে (কখনো পারিবারিক কখনোবা সার্বজনীন) যেভাবে মাইক এবং বক্সের শব্দতাণ্ডব চালানো হয় তার থেকে কেউ রেহাই পায় না! ঐসব দিনগুলিতে দিনভর মণ্ডপ ও তার আশেপাশে মাইক বাজানো হয়। এ ছাড়াও ভাসানে মাত্রাতিরিক্ত জোরে সাউন্ড বক্স বাজানো ও শব্দ বাজি ফাটানো হয়। প্রকাশ্য রাস্তায় একটি ভ্যানে ১০ থেকে ১২টি সাউন্ড বক্স ও আট-দশটি চোঙা মাইক, সাথে

জেনারেটর একসঙ্গে তুলে তারস্বরে বাজিয়ে উদ্দাম নাচতে নাচতে ভাসানে যাওয়াটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শব্দের তীব্রতা পরিমাপের একক ডেসিবেল (ডিবি)। শব্দের মাত্রা ৪৫ ডিবি হলেই সাধারণত মানুষ ঘুমাতে পারে না। ৮৫ ডিবিতে শ্রবণ শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে এবং মাত্রা ১২০ ডিবি হলে কানে ব্যথা শুরু হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, যদি তিন বছরের কম বয়স্ক শিশু কাছাকাছি দূরত্ব থেকে ১০০ ডিবি মাত্রার শব্দ শোনে, তাহলে সে তার শ্রবণ ক্ষমতা হারাতে পারে। মানুষ সাধারণত ১৫ থেকে ২০ কিলোহার্টজ (KHZB) স্পন্দনের শব্দ শোনে।

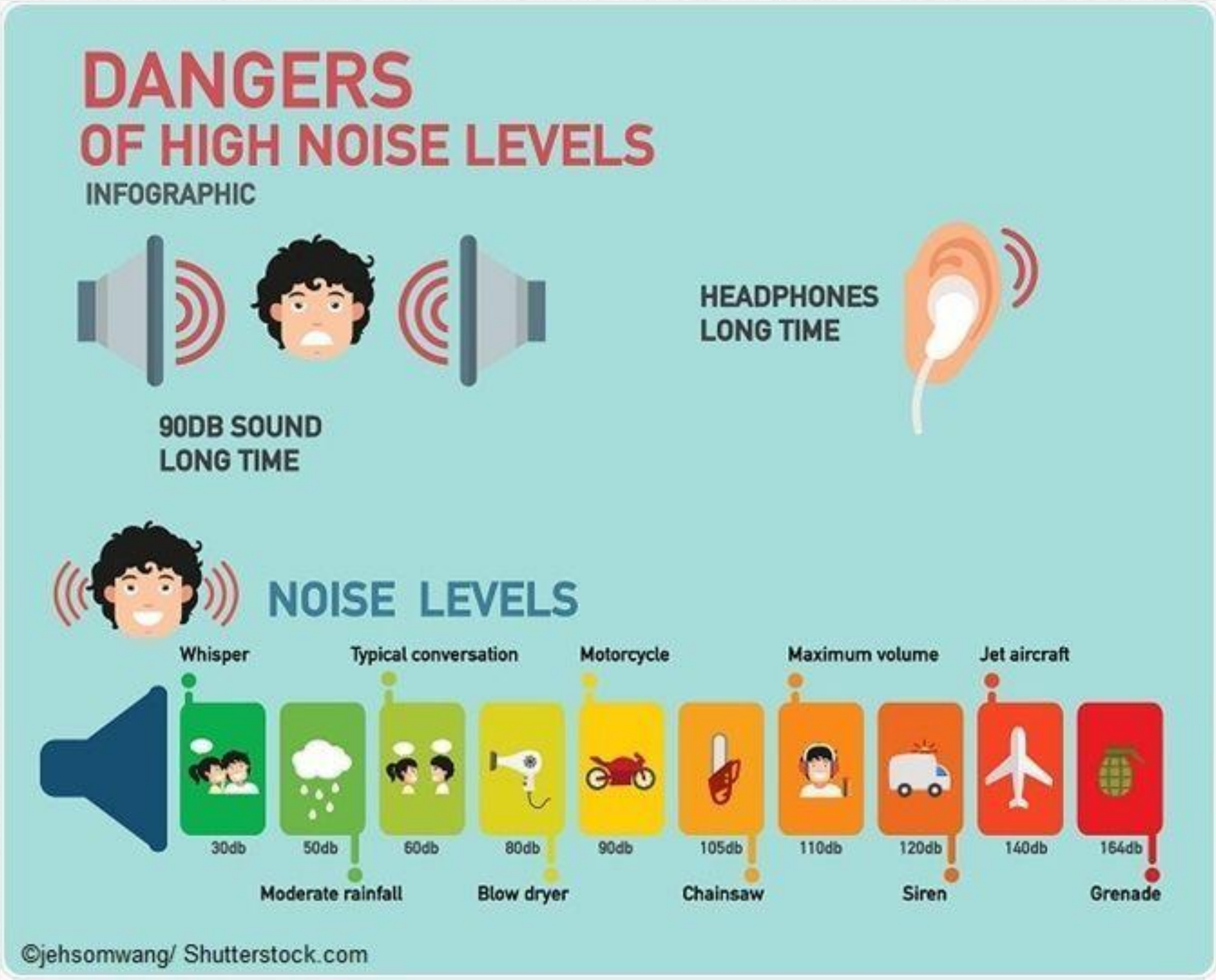
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতানুসারে, সাধারণত ৬০ ডিবি শব্দ একজন মানুষকে সাময়িকভাবে বধির করে ফেলতে পারে এবং ১০০ ডিবি শব্দ সম্পূর্ণ বধিরতা সৃষ্টি করতে পারে।

চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, শব্দবাজি এবং ডিজের আওয়াজে মানুষের শরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলে এবং শ্রবণশক্তি নষ্ট

হতে পারে। হৃদ্‌রোগীদের পক্ষেও জোর শব্দ ভীষণ ভাবে ক্ষতিকারক। তাই শব্দ দূষণকে বলা হয় নীরব ঘাতক।



আজ আমার রক্ত গরম, আমার বাড়িতে বয়স্ক কোন লোক নেই, বাচ্চা নেই, বক্স এবং মাইকের মুখ আমার বাড়ির দিকে নয়, তাই আমি গায়ের জোরে উচ্চস্বরে মাইক বক্স চালালে অন্যের ক্ষতি হবে, তাতে আমার কি! এই মানসিকতা নিয়ে যারা রয়েছেন তাদের বলব আগামী দিনে আপনিও বয়স্ক হবেন, আপনার বাড়ি তো একদিন না একদিন ছোট শিশু জন্মাবে! তখন যদি আগামী প্রজন্ম তাদের রক্তের গরমে চোখ দেখিয়ে আপনার বাড়ির দিকে মাইক বক্স করে উচ্চশব্দে গান-বাজনা চালায় তখন আপনি সহ্য করতে পারবেন তো?



মানবিকতার নামে দানবিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। নিজেদের আনন্দের জন্য যাঁরা আইন ভেঙে সাধারণ মানুষকে সমস্যায় ফেলেন, তাঁদের জন্য আইনের সহায়তা নেয়া একমাত্র উপায়।

তাই বলব সার্বজনীন শুভ অনুষ্ঠান মানবিকতার দিক বজায় রেখেই করুন। আপনাদের অনুষ্ঠানের অর্থ যদি হয়ে থাকে সকলের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী এবং ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখা, অন্যের ক্ষতিসাধন না করা, সকলের মুখে হাসি ফোটানো, তাহলে আশা করব আপনারা শব্দ দূষণকে নীরব ঘাতক হিসেবে ব্যবহার করবেন না। নির্ধারিত নিয়ন্ত্রিত

মাত্রা বজায় রেখে অনুষ্ঠান করুন তাতে সকলেই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবে, সকলের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

জাফরপুর, প্রামানিক পাড়া

ফলতা, দক্ষিণ 24 পরগনা

"গণতন্ত্রের সূচনাই হয় বাকস্বাধীনতায়। বাকস্বাধীনতার মূল কথা হচ্ছে আপনি যা শুনতে চান না, আমার তা বলার অধিকার।"

- হুমায়ুন আজাদ

যুক্তিবাদীরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পশুবলির বিরুদ্ধে কেন?

-চিত্রদীপ সোম

ঈদ বা এই জাতীয় উৎসব আসলে অনেক নাস্তিক বা মুক্তমনাই ধর্মীয় উৎসবে পশুবলিদানের বিরোধিতা করেন। এই নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ টিটকিরিও সহ্য করতে হয় তাদের। অনেকেরই ধারণা যুক্তিবাদীরা ধর্ম মানেন না বলে নিজেরা অন্য সময় কবজি ডুবিয়ে মাংস খেলেও শুধুমাত্র অন্ধ ধর্ম বিরোধিতার কারণেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পশুবলির বিরোধিতা করেন। এটা তাদের ভণ্ডামো ও স্ববিরোধিতা ছাড়া কিছু নয়। ধর্ম পরিচয়ে মুসলিম এক বিপ্লবী এই মর্মে একটি দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছিলেন দেখলাম।



আসল সমস্যাটা হচ্ছে মূল বিষয়টা ধরতে না পারার ক্ষেত্রে। প্রশ্নটা পশু হত্যা বন্ধের নয়, প্রশ্নটা প্রকাশ্যে অমানবিকভাবে পশু হত্যা নিয়ে। প্রকাশ্যে এইভাবে অমানবিক পদ্ধতিতে

পশুহত্যা করলে যারা দর্শক হয় তাদের মনের উপর দীর্ঘস্থায়ী খারাপ প্রভাব পড়ে।

বিশেষ করে কোমলমতি বাচ্চাদের মনের উপর। পরবর্তীকালে তাদের নিষ্ঠুর ও অপরাধপ্রবণ হবার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই কারণে যুক্তিবাদীরা বরাবরই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পশুবলির বিরোধিতা করে, কারন তা করা হয় হাজার হাজার লোকের চোখের সামনে। খাদ্যের কারণে পশুহত্যার বিরোধিতা কখনও যুক্তিবাদীরা করে না। এবং জেনে রাখুন ধর্মের নামে পশুবলিদানের বিরোধিতা শুধুমাত্র যুক্তিবাদীরাই করেন তা নয়, ভারতীয় আইন অনুসারেও ধর্মীয় উৎসবে পশুবলিদান সম্পুর্ন বেআইনী।

The Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 অনুসারে প্রকাশ্যে ধর্মের নামে পশুবলি দেওয়া রীতিমত দন্ডনীয় অপরাধ।

আইনভঙ্গকারীর জন্য ধার্য আছে জেল ও জরিমানার ব্যবস্থা (একইভাবে মাংসের দোকানগুলিতে যেভাবে প্রকাশ্যে মুরগীকে মারা হয় বা খাসীর দোকানে মৃত ছাল ছাড়ানো

খাসী উলটো করে ঝুলিয়ে রাখা হয় বেআইনী সেটাও। আইন অনুযায়ী প্রতিটি স্লটার হাউসে লোকচক্ষুর আড়ালে প্রানীহত্যা করে খরিদ্দারকে তার চাহিদা অনুযায়ী মাংস প্যাকেটে ভরে দিতে হবে। এজন্য প্রতিটি স্লটার হাউসে উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকা আবশ্যক)। কিন্তু এদেশে আর কবে আইন মেনে সবকিছু করা হয়। তাই আরো হাজার হাজার আইনের মতো এটাও এদেশে মানা হয় না যথারীতি। এবং আমরাও উদাসীন। বরং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা আশেপাশের মাংসের দোকানে ছোটবেলা থেকে আইন না মেনে পশুহত্যা দেখতে দেখতে আমরা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে দিব্যি গা সওয়া হয়ে গিয়েছে আমাদের এসব। বাড়ির শিশুদেরও তাই নির্দ্বিধায় নিয়ে যাই মাংসের দোকানে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বলে রাখা ভালো, ইসলাম ধর্মে পশুকে আড়াই প্যাঁচে যেভাবে হত্যা করা হয় সেটাও অবৈজ্ঞানিক ও অমানবিক। খাদ্যের জন্য পশুহত্যা করতে হলে উচিত পশুকে এক কোপে কাটা, যাতে যতদূর সম্ভব কম যন্ত্রণা দেওয়া হয়। আরো ভালো হয় হত্যার আগে অজ্ঞান করে নিলে।

আশা করা যায় বোঝাতে পেরেছি কেন কিছু মানুষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান আসলেই পশুবলিদানের বিরোধিতা করে হইচই করেন। এরপরেও কেউ আপত্তি করলে বুঝতে হবে ধর্ম

তাদের বাস্তববোধ ও সংবেদনশীলতার ভিতকে নষ্ট করে তাকে করে তুলেছে অন্ধ ধর্মীয় অনুগামীমাত্র, যাদের কাছে ধর্মের নামে সবকিছুই করা 'জায়েজ'।

"বিগত কুড়ি বৎসর ধরিয়া বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব নিহিত আছে।"

- মেঘনাদ সাহা



বিবর্তনবাদ সম্পর্কে কয়েকটি ভুল ধারণা

-পা র্থ প্র তি ম পা ল

১. বিবর্তনবাদ একটি থিওরি মাত্র - না। বিবর্তন একটি "ফ্যাক্ট". "প্রাকৃতিক সিলেকশনের দ্বারা বিবর্তন হয়েছে" এটা একটা থিওরি। ঠিক যেভাবে মহাকর্ষ একটা ফ্যাক্ট কিন্তু নিউটনের মহাকর্ষবাদ একটা থিওরি।

"প্রাকৃতিক সিলেকশনের দ্বারা বিবর্তন হয়েছে" এর সপক্ষে এত প্রমান আছে যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মত এটা একটা সুপ্রতিষ্ঠিত থিওরি। প্রতিনিয়ত এর উন্নতি ও সংস্করণ চলছে কিন্তু এর মূল বিষয়বস্তু প্রশ্নাতীত ভাবে প্রমাণিত। বিবর্তনের প্রমাণসমূহ সহজভাবে জানতে হলে "The Greatest Show on Earth" বইটা পড়তে পারেন।

২. বিবর্তনবাদ কিভাবে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে সেটা বলে - না। প্রাণের আবির্ভাব সম্পর্কে বিবর্তনবাদ কিছু বলে না। প্রাণের সৃষ্টির পর কিভাবে সেটার পরিবর্তন হয়েছে সেটা বিবর্তনবাদ বলে।

৩. মানুষ শিম্পাঞ্জি থেকে এসেছে - ভুল। মানুষ ও শিম্পাঞ্জি একই "পূর্বপুরুষ" থেকে এসেছে। কিন্তু দুজনেই মডার্ন এনিম্যাল। শিম্পাঞ্জি, মানুষ ও মানুষের পূর্বপুরুষের মধ্যবর্তী জীব নয়। শিম্পাঞ্জি "প্রাকৃতিক সিলেকশনের" হিসেবে ততটাই ফিট যতটা মানুষ। নইলে তারা অবলুপ্ত হয়ে যেত।

৪. বিবর্তনের ফাইনাল প্রোডাক্ট মানুষ - ভুল। সমস্ত জীবিত প্রজাতিই বিবর্তনের "ফাইনাল প্রোডাক্ট" এবং বিবর্তন যেহেতু বন্ধ হয়না সুতরাং ভবিষ্যতে আরও "ফাইনাল" প্রোডাক্ট আসবে। বিবর্তনকে গাছের মত "ট্রি স্ট্রাকচার" কল্পনা করতে পারেন। প্রতিটি এন্ড এক একটি প্রজাতি। সবগুলো এন্ডি-ই একইভাবে "ফিট" ও প্রাকৃতিক সিলেকশনে জিতে এসেছে। মানুষ ও হাতি বিবর্তনবাদের হিসেবে দুজনেই "ফিট"

৫. বিবর্তনবাদ প্রাকৃতিক পরিস্তিতির চাপে হয়। - সরাসরি ভুল নয় কিন্তু এর মধ্যে একটা মিসকনসেপশন আছে। ধরুন আমার ও আমার স্ত্রীর চামড়া "সাদা" . আমি যদি আজ আফ্রিকায় থাকি যেখানে কালো চামড়ার লোকেরা প্রাকৃতিক সুবিধা পায় (স্কিন ক্যান্সার ইত্যাদি থেকে). আপনার মনে

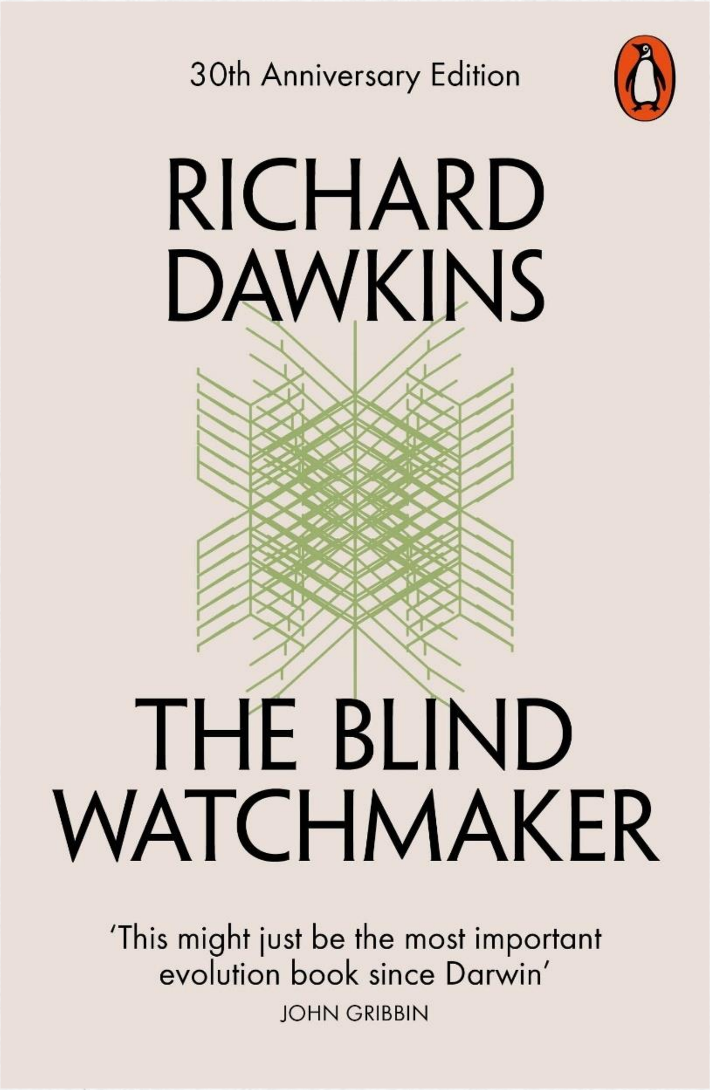
হতে পারে আমার ছেলেরা ধীরে ধীরে "কালো চামড়ার" হবে এমনকি যদি সবাই বিয়ের সময় "সাদা চামড়ার লোককে বিয়ে করে তাহলেও। না। সেটা হবে না।

বিবর্তন হয় মিউটেশনের ফলে। মিউটেশন রান্ডম। মানে সাদা চামড়ার লোকের ছেলের কালো হবার যে সম্ভাবনা সেটা আফ্রিকাতে যা আমেরিকাতেও তাই। মিউটেশন পরিবেশের চাপে হয় না। বিবর্তনবাদ কেবল মাত্র যে মিউটেশন জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকে ও সন্তান উৎপন্ন করে সেগুলোকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করে মাত্র। মানে আপনি যদি দুটো চিকেনকে "উড়লে সুবিধা" এই রকম পরিবেশে রাখেন আর দুজনকে "সাঁতার কাটলে সুবিধা" এই দুটো পরিবেশে রাখেন তাদের উত্তরসূরিদের মধ্যে "সাঁতার কাটার" ও "উড়তে পারার" মিউটেশনের হার একই। কিন্তু যে পরিবেশে "উড়তে পারলে সুবিধা" সেখানে যে চিকেন গুলোর সেই সুবিধা আছে তারা জীবনযুদ্ধে এগিয়ে থাকবে ও বেশি সন্তান উৎপন্ন করবে। এবং ধীরে ধীরে "সাঁতার কাটলে সুবিধা" এই মিউটেশনটা হারিয়ে যাবে। প্রসঙ্গত এখানে আমি "সাদা বা কালো চামড়া" বা উড়তে পারাকে মিউটেশন বলছি সহজ করার জন্য। বাস্তবে সেটা অনেক জটিল।

৫. বিবর্তনবাদ ক্রমশ ইম্প্রোভমেন্ট করে - না। এক পরিবেশে এর ফলে উড়তে না পারা পাখি সৃষ্টি হতে পারে,

অন্য পরিবেশে উড়তে পারা। একই পরিবেশ যদি পরিবর্তন হয় তাহলে যারা আজ "ফিট" তারা আনফিট হয়ে যেতে পারে ও হয়ও।

৬. বিবর্তনবাদ নিখুঁত - একেবারেই না। বহু ট্রায়াল এন্ড এরর আছে। এবং এর ফলে বোঝা যায় কেউ সরাসরি মানুষ বা অন্য জীব সৃষ্টি করেননি। আরও জানতে “The Blind Watchmaker” পড়তে পারেন।



৭. ভাল জিনরাই সিলেক্ট হয়। - সমসময় নয়। ধরুন যদি কোন জীন ৫০ বছরের পর একটিভ হয় তাহলে সেই জীন সন্তানের মধ্যে যেতে কোন অসুবিধা নেই। কারন বেশিরভাগ মানুষ ৫০ এর আগেই সন্তান উৎপন্ন করে ফেলেছে। এই জন্য দেখবেন অনেক জিনঘটিত রোগ আছে সেগুলো কেবল বয়স হলে সক্রিয় হয়। এছাড়া অনেক "খারাপ" জীন বা "অদরকারি" প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আস্তে পারে যদি তাদের ক্ষতিটা খুব বেশি না হয়।

বলে রাখি এখানে আমায় “সহজীকরণ” করতে হয়েছে। কিন্তু চেষ্টা করেছি যতটা নির্ভুল থাকা যায় তার।



পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ২০২২

- সরোজ নাগ

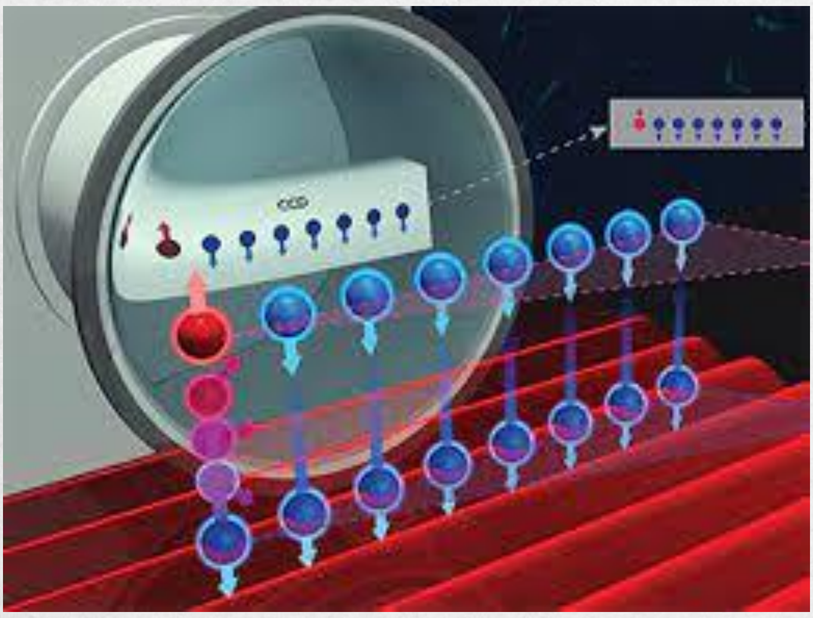
মহাবিশ্বের অতি ক্ষুদ্র জগৎ সত্যিই রহস্যময়। আমরা জানি যে সেখানে কণাদের অস্তিত্ব রয়েছে। যখন সেই কণাগুলোকে পরিমাপ করা হয় তখন কণাগুলির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা এটাও জানি যে একটি

কোয়ান্টাম দশা (quantum state) পরিমাপ করতে গেলে তাদের আপনি যা পরিমাপ করবেন তা মৌলিকভাবে পরিবর্তিত (alter) বা নির্ধারিত (determine) হতে পারে। এমনকি দুটি কোয়ান্টাকে একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করানোর ফলেও একই ঘটনা ঘটে। একজন পর্যবেক্ষকের ক্রিয়াকলাপ ছাড়া সেই অবজেক্টিভ বাস্তবতা কোনো মৌলিক উপায়ে বিদ্যমান বলে মনে হয় না।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে প্রকৃতি কোনো নিয়ম মেনে চলে না। এই নিয়মগুলি বিদ্যমান, যদি সেগুলি আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন এবং সাধারণ জ্ঞানের বিপরীতে (counterintuitive) হয়, তবুও সেগুলো রয়েছে। এমনকি দুটি এন্ট্যাঙ্গল হয়ে থাকা কোয়ান্টাম দশাকে অবশ্যই কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে।

এভাবেই কোয়ান্টাম জগতে এক নতুন বৈপ্লবিক ধারণার বিকাশ ঘটছে যার নাম quantum information science.

এই কোয়ান্টাম ইনফরমেশন সিস্টেম, এনট্যাঙ্গল হয়ে থাকা

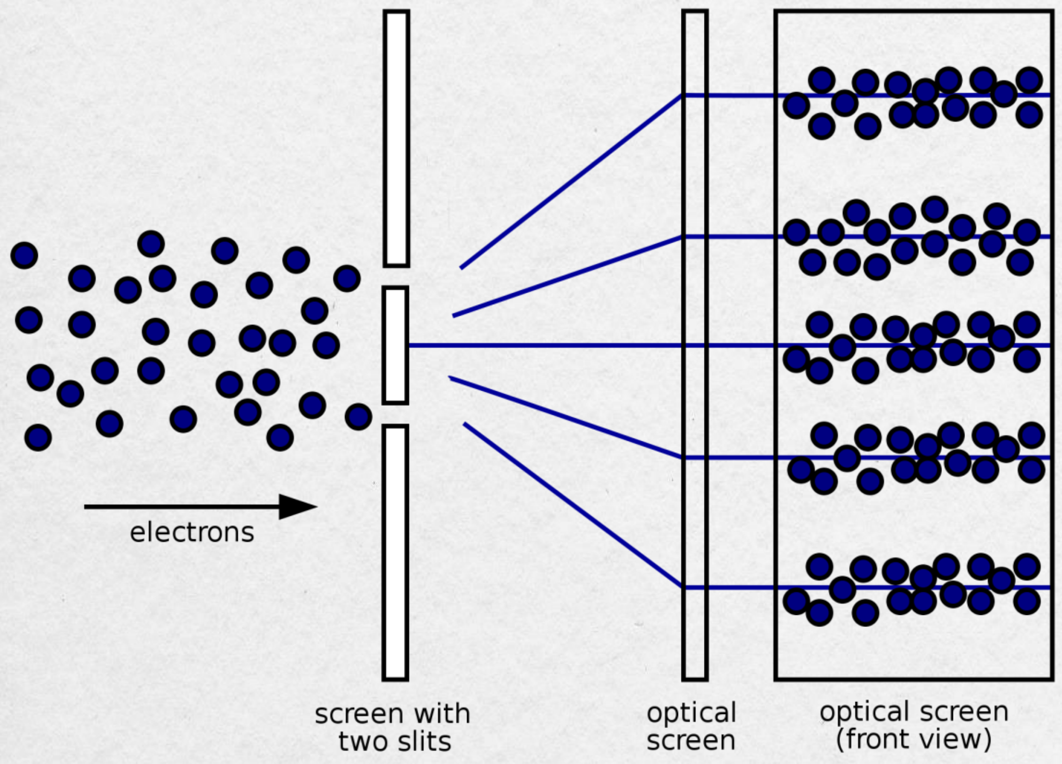


ফোটন আর বেলের অসমতা লঙ্ঘনের (violation of Bell’s inequalities) অগ্রণী

গবেষণার জন্য 2022 সালের পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তিনজন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী জন ক্লজার (John F. Clauser), অ্যালাইন অ্যাসপেক্ট (Alain Aspect) এবং অ্যান্টন জেইলিংগারকে (Anton Zeilinger) এই অতি সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

আমাদের কোয়ান্টাম বাস্তবতার অনির্দিষ্ট প্রকৃতিকে প্রকাশ করে এমন অনেক ধরণের পরীক্ষা আমরা করতে পারি। যেমন -

একটি উপযুক্ত বাক্সে বেশ কয়েকটি তেজস্ক্রিয় পরমাণু রাখুন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সেই সময় পরে গড়ে কতগুলি পরমাণু থাকবে আর কতগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, আপনি ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন। কিন্তু কোন পরমাণু টিকে থাকবে এবং থাকবে না তা আগে থেকে বলার কোনো উপায় আপনার কাছে নেই। আমরা শুধুমাত্র পরিসংখ্যানগত সম্ভাবনা খুঁজে পেতে পারি।



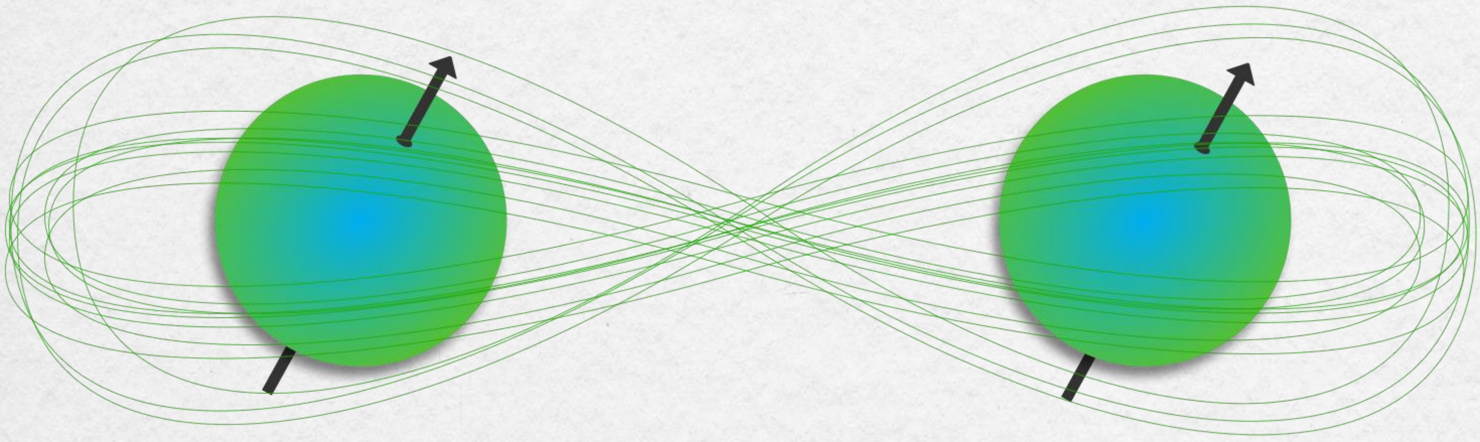
বিখ্যাত double slit পরীক্ষায় সংকীর্ণ ব্যবধানযুক্ত দুটো ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে পরপর অনেকগুলো কণা নিক্ষেপ করলে পিছনে পর্দায় কী ধরণের interference প্যাটার্ন তৈরি হবে তা অনুমান করতে আপনি সক্ষম হবেন। প্রতিটি পৃথক কণার জন্য, এমনকি যখন একবারে একটি কণাকে স্লিটের মাধ্যমে পাঠানো হয়, আপনি কিছুতেই আগে থেকে নির্দিষ্ট করতে পারবেন না যে এটি কোথায় কোন ছিদ্র দিয়ে গিয়ে পর্দায় আঘাত করবে।

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার কিছু দিক সম্পূর্ণ র‍্যান্ডম বলে মনে হয়। কিন্তু এগুলি কি সত্যিই র‍্যান্ডম, নাকি এই সিস্টেমগুলি সম্পর্কে আমাদের তথ্য সীমিত থাকার জন্য এগুলিকে কেবল র‍্যান্ডম দেখায়?

আমাদের কাছে থাকা সেই তথ্যগুলো কি একটি অন্তর্নিহিত বাস্তবতা প্রকাশ করার জন্য অপর্যাপ্ত? কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূচনা থেকেই আইনস্টাইন থেকে বোর এবং তার পরেও বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে তর্ক করেছেন।

কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে বিজ্ঞানীরা কেবল যুক্তিতর্কের উপর ভিত্তি করে নয় বরং পরীক্ষানিরীক্ষার উপর ভিত্তি করে বিষয়গুলি নির্ধারণ করেন। আমরা যদি কোয়ান্টাম

সিস্টেমের বাস্তবতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন নিয়মগুলি জানতে পারি তাহলে আমরা সেই সিস্টেমের প্রত্যাশিত, সম্ভাব্য আচরণটি নির্ণয় করতে পারি। এরপর পর্যাপ্ত পরিমাপে সেটআপ এবং যন্ত্রপাতি দেওয়া হলে, আমরা পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের ভবিষ্যৎবাণী পরীক্ষা করতে পারি এবং আমরা যা পর্যবেক্ষণ করি তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। আমরা সম্ভব হলে এমন একটি পরীক্ষাও ডিজাইন করতে পারি যা বাস্তবতা সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর ধারণা পরীক্ষা করতে পারে। যেমন কোয়ান্টাম সিস্টেমের জন্য যতক্ষণ না তাদের পরিমাপ করা হয় তখন সেই সিস্টেমে কোনো মৌলিক অনিশ্চয়তা আছে কিনা অথবা আমাদের বাস্তবতার অন্তর্নিহিত কিছু "লুকানো ভেরিয়েবল" বা “hidden variable” আছে কি না যা পরিমাপ করার আগেই ফলাফল কী হতে চলেছে তা পূর্ব-নির্ধারণ করে।



এই ধরনের প্রশ্নগুলোর একটা সমাধান পাওয়া যেতে পারে একটি বিশেষ ধরনের কোয়ান্টাম সিস্টেমে, তা হলো একটি এনট্যাঙ্গল হয়ে থাকা কোয়ান্টাম সিস্টেম। আপনাকে যা করতে হবে তা হল কণার একটি entangled জোড়া তৈরি

করা, যেখানে একটি কণার কোয়ান্টাম দশা অন্যটির কোয়ান্টাম দশার সাথে সম্পর্কযুক্ত (correlated)। যদিও স্বতন্ত্রভাবে দেখলে, উভয়েরই সম্পূর্ণরূপে র‍্যান্ডম এবং অনির্দিষ্ট কোয়ান্টাম দশা রয়েছে, কিন্তু একসাথে হিসেবে নেওয়া হলে উভয় কোয়ান্টার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা উচিত।

এমনকি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জন্যও এই বিষয়টি অদ্ভুত বলে মনে হয়। সাধারণত আমরা জানি যে কোনো সংকেত তার তথ্য সমেত শূন্যস্থানে আলোর চেয়ে বেশি গতিতে যেতে পারে না। কিন্তু আপনি যদি -

- একটি কণার একটি এনট্যাঙ্গল হয়ে থাকা কণা তৈরী করেন
- এবং তারপর তাদের খুব বেশি দূরত্বে পৃথক করে রাখেন
- এবং তারপর তাদের একটির কোয়ান্টাম অবস্থা পরিমাপ করেন
- তখন অন্যটির কোয়ান্টাম অবস্থা হঠাৎ করে নির্ধারিত হয়
- আর সেই নির্ধারিত হওয়া আলোর গতিতে নয়, বরং তাৎক্ষণিকভাবে হয়!

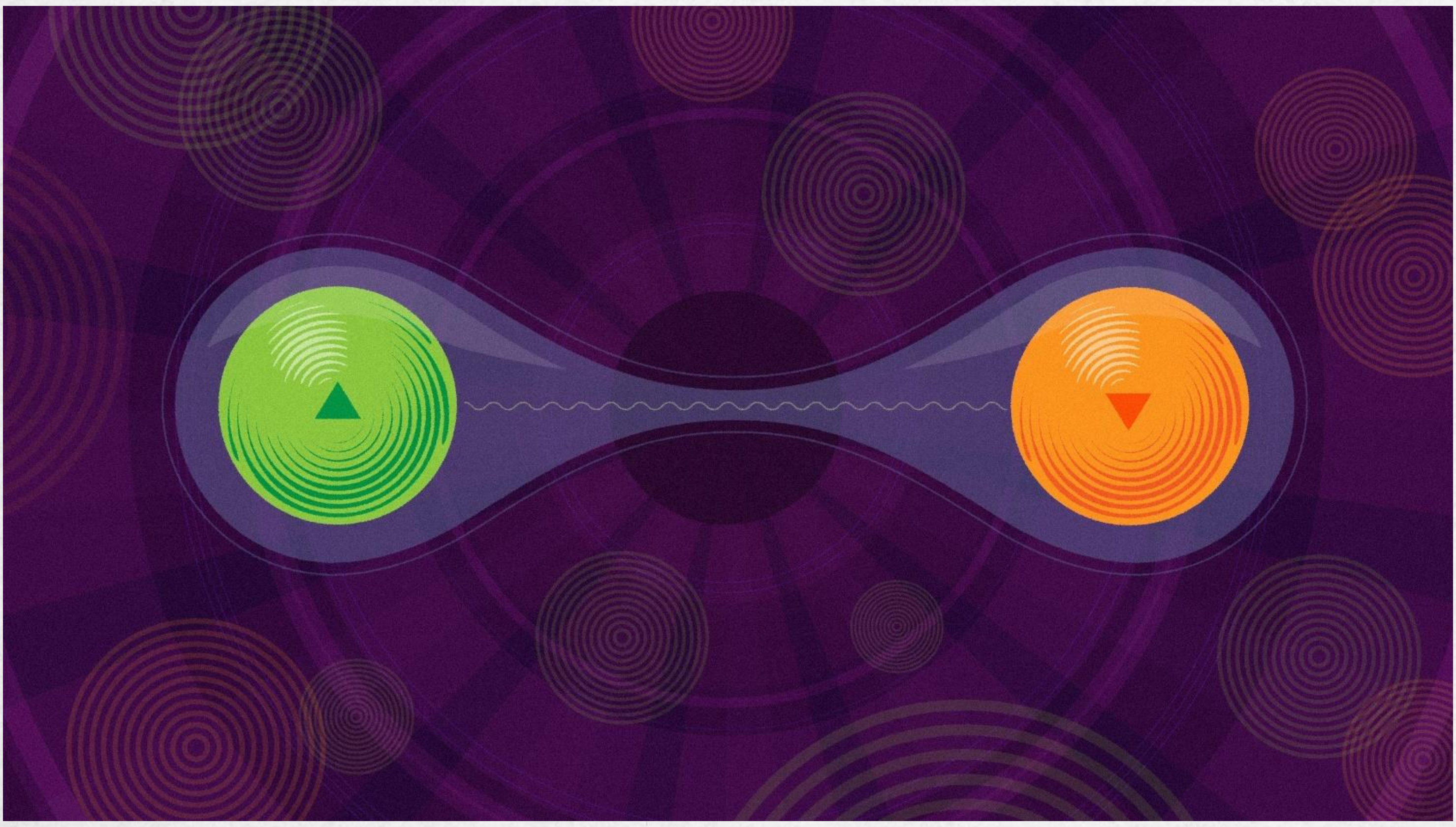
এর আগে বিজ্ঞানীরা 33 কিমি দূরে অবস্থিত রুবিডিয়াম-87 পরমাণুর এনট্যাঙ্গল জোড়া তৈরী করে পরীক্ষা

করেছিলেন। [তথ্যসূত্র - 1 দ্রষ্টব্য] এবং তাঁরা দেখেছিলেন যে এনট্যাঙ্গল ঘটনাটি সত্যিই সঙ্গে সঙ্গে ঘটে। তবে কি এই ঘটনা বিজ্ঞানের একটা মূলগত ধারণাকে নস্যাৎ করে? না। যদিও কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট দীর্ঘ দূরত্বে কণাগুলিকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রভাব পড়তে পারে, আমরা আলোর গতির চেয়ে দ্রুত তথ্য পরিবহন করতে এটিকে ব্যবহার করতে পারি না। শুধু এনট্যাঙ্গলমেন্ট নিজেই তথ্য পাঠানোর জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন দীর্ঘ দূরত্ব জুড়ে কোয়ান্টাম দশাকে স্থানান্তর করতে এনট্যাঙ্গলমেন্ট ব্যবহার করতে সক্ষম। এই টেলিপোর্টেশনের জন্য entangled qubits ছাড়াও একটি ক্লাসিক্যাল বিট পাঠানোর প্রয়োজন হয়। সুতরাং, এনট্যাঙ্গলমেন্ট তাৎক্ষণিকভাবে কাজ করে, কিন্তু তথ্যের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া ক্লাসিক্যাল ইনফরমেশনের গতি দ্বারা সীমিত, যা আলোর গতিতে এগিয়ে চলে। পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানীরা যদিও এ সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। [তথ্যসূত্র - 2 দ্রষ্টব্য]

যাইহোক, প্রসঙ্গে ফিরে আসি। কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট আমরা সাধারণ ভাবে যতটা ভাবি বাস্তবে অতোটাও সহজ নয়। যেমন যদি একটি কণাকে "স্পিন আপ" হিসাবে পরিমাপ করা হয়, তবে এর অর্থ এই নয় যে অন্যটি 100% সময়েই "স্পিন ডাউন" হবে। তার মানে হলো যে অন্যটি হয় "স্পিন আপ" বা "স্পিন ডাউন" হওয়ার সম্ভাবনা কিছু

পরিসংখ্যানগত নির্ভুলতার সাথে ভবিষ্যৎ বাণী করা যেতে পারে। এটা নির্ভর করবে আপনার পরীক্ষার সেটআপের উপর। সেই সেটআপের উপর নির্ভর করে এনট্যাঙ্গলমেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা দাঁড়াবে 50% এর বেশি, কিন্তু 100% এর কম।

এই অনিশ্চয়তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 1960-এর দশকে জন স্টুয়ার্ট বেল এই ঘটনার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন। এবং তা থেকেই নির্ণয় করেছিলেন বিখ্যাত Bell’s inequality বা বেলের অসমতা। এই অসমতা নিশ্চিত করে যে দুটি এনট্যাঙ্গল হয়ে থাকা কণার পরিমাপকৃত দশার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (correlations) কখনই একটি নির্দিষ্ট মান অতিক্রম করতে পারে না। অথবা তা এভাবেও বলা যায় "local hidden variables" উপস্থিত থাকলে এই এনট্যাঙ্গল হয়ে থাকা দশার মধ্যে পরিমাপ করা পারস্পরিক সম্পর্ক কখনই একটি নির্দিষ্ট মান অতিক্রম করবে না।



এই ক্ষেত্রে "স্থানীয়" বা "local" বলতে স্থানীয়তার নীতি (principle of locality) বোঝায়। এই নীতি অনুযায়ী একটি কণা শুধুমাত্র তার ঠিক আশেপাশের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। এবং তার সাথে ফিজিক্যাল ক্ষেত্রের (fields) মাধ্যমে করা মিথস্ক্রিয়া (interactions) আলোর গতির চেয়ে বেশি দ্রুত গতিতে ঘটতে পারে না। আর Hidden variables হল কোয়ান্টাম কণা দ্বারা আবিষ্ট (possessed) কাল্পনিক বৈশিষ্ট্য, এমন বৈশিষ্ট্য যা সনাক্ত করা যায় না কিন্তু তবুও পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করে। বিজ্ঞানী বেল বলেছিলেন "যদি (একটি লুকানো ভেরিয়েবল তত্ত্ব) লোকাল হয় তবে এটি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাথে একমত হবে না, এবং যদি এটি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাথে একমত হয় তবে এটি লোকাল হবে না।"

তবে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টাম মেকানিক্স কোনো hidden variables ছাড়াই এই বেলের অসমতা লঙ্ঘন করবে। যার ফলে সঠিক পরিস্থিতিতে বা সেট আপে সেই পারস্পরিক সম্পর্ক (correlations) আশাতীত ভাবে শক্তিশালী হবে। তার মানে এনট্যাঙ্গলমেন্টের শতকরা পরিমান অনেক বৃদ্ধি পাবে। বিজ্ঞানী বেল এই ভবিষ্যৎ বাণীই করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা অস্থায়ী (untestable) ছিলো।

এবং সেখানেই এই বছরের পদার্থবিদ্যায় নোবেল বিজয়ীদের অসাধারণ অগ্রগতির প্রসঙ্গ আসে।

প্রথমে আসে জন ক্লজারের গবেষণা। ক্লজার যে ধরনের কাজ করেছিলেন তা তাত্ত্বিক পদার্থবিদরা প্রায়শই খুব কম মূল্যায়ন করেন। তিনি বেলের গভীর কিন্তু অব্যবহারিক কাজগুলি নিয়েছিলেন এবং সেগুলিকে উন্নত করেছিলেন যাতে তাদের একটি ব্যবহারিক পরীক্ষা তৈরি করা যায়। তিনি কাজ করেছিলেন CHSH inequality নিয়ে যেখানে C অক্ষরটি তাঁরই নামানুসারে। এই অসমতা নিয়ে বিশদে না বললেও এটুকু বলা যায় এখানে একজন পর্যবেক্ষকের কাছে একজোড়া এনট্যাঙ্গল কণা থাকে। তাঁর কাছে দুটি আলাদা লম্ব দিকের একটিতে তাদের কণার স্পিন পরিমাপ করার চয়েস থাকে।

যদি বাস্তবতা (reality) পর্যবেক্ষকের উপর নির্ভর না করে, তাহলে প্রতিটি পৃথক পরিমাপকে অবশ্যই অসমতা (inequality) মেনে চলতে হবে। যদি তা না হয় (যেমন স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টাম মেকানিক্স), সেই অসমতা লঙ্ঘন করা যেতে পারে।

ক্লজার তাঁর ছাত্র স্টুয়ার্ট ফ্রিডম্যানের সাথে পরীক্ষাটির ডিজাইন ও সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি নির্ধারণ

করেছিলেন যে এটি আসলে বেলের (এবং CHSH) অসমতা লঙ্ঘন করেছে। স্থানীয় লুকানো পরিবর্তনশীল তত্ত্বগুলি (Local hidden variable), আমাদের মহাবিশ্বের কোয়ান্টাম বাস্তবতার সাথে দ্বন্দ্ব দেখায়। এবং এটা সত্যিই একটি নোবেল-যোগ্য কৃতিত্ব!

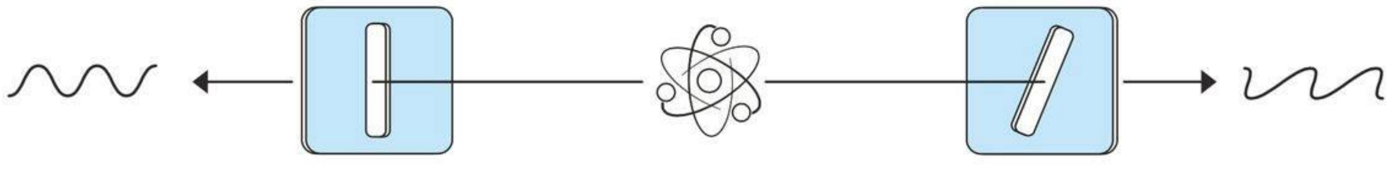
কিন্তু বিজ্ঞানীদের প্রশ্ন অবিরাম, অবিরত। কোনো পরীক্ষার অন্তর্গত কেবলমাত্র সেই অনুমানগুলি ছাড়া আর কি কোনো কিছু হওয়া সম্ভব নয়? এখনো কি কিছু বিশেষ ধরনের লুকানো পরিবর্তনশীল থাকা সম্ভব যা এখনও বিজ্ঞানী ক্লজারের পরিমাপ করা ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে?

এই বছরের নোবেল বিজয়ীদের মধ্যে দ্বিতীয় বিজ্ঞানী অ্যালাইন অ্যাসপেক্টের কাজটি এখানেই আসে। অ্যাসপেক্ট বুঝেছিলেন যে যদি দুটি পর্যবেক্ষক একে অপরের সাথে কার্যকারন যোগাযোগে (causal contact) থাকেন [অর্থাৎ, যদি তাঁদের একজন অন্যজনকে তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে আলোর গতিতে তথ্য পাঠাতে পারেন এবং অন্য পর্যবেক্ষক তাঁর ফলাফল পরিমাপ করার আগে সেই ফলাফলটি পেতে পারেন] তাহলে একজন পর্যবেক্ষকের পরিমাপের "পছন্দ" (choice) অন্যটির উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

1980 এর দশকের গোড়ার দিকে, সহযোগী ফিলিপ গ্রেঞ্জিয়ার, জেরার্ড রজার এবং জিন ডালিবার্ডের সাথে অ্যাসপেক্ট বেশ কয়েকটি গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন যা অনেক ক্ষেত্রেই ক্লজারের কাজকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছিল। তিনি বেলের অসমতার লঙ্ঘনকে অনেক বেশি পরিমাপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি আগের আগের পরীক্ষাগুলিতে সর্বোচ্চ 55%-এর সীমায় বেলের অসমতার লঙ্ঘনের চেয়ে তাত্ত্বিক মতের 83% মাত্রার লঙ্ঘিত হওয়াকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর পরীক্ষার সেটআপে ব্যবহৃত প্রতিটি ফোটনের পোলারাইজারের orientation কে দ্রুত ও ক্রমাগত র‍্যান্ডম পরিবর্তন করে তিনি দেখিয়েছেন যে দুজন পর্যবেক্ষকের মধ্যে যেকোনও "stealth communication" আলোর গতির চেয়ে অনেক বেশি গতিতে ঘটা সম্ভব। [তথ্যসূত্র - 3 দ্রষ্টব্য]

সেই শেষ কৃতিত্বটি ছিল সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, পরীক্ষাটি এখন বিজ্ঞানীমহলে third Aspect experiment হিসেবে পরিচিত। বিজ্ঞানী অ্যাসপেক্ট যদি অন্য কিছু না-ও করতেন তবে শুধু এই লোকাল, বাস্তব লুকানো ভেরিয়েবলের (real hidden variables) সাথে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অসঙ্গতি প্রদর্শন করার পরীক্ষাটিই তাঁকে খ্যাতি ও সম্মানের শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো।

কিন্তু তবুও বিজ্ঞানীরা আরও নিখুঁত লুপহোল বিহীন পরীক্ষা চেয়েছিলেন। এই সমবর্তন সেটিংস (polarization settings) কি সত্যিই র‍্যান্ডম বা এলোমেলোভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল নাকি সেগুলো pseudorandom ও হতে পারে? যেখানে হয়তো দুজন পর্যবেক্ষকের মধ্যে প্রেরিত কিছু অদেখা সংকেত আলোর গতিতে ভ্রমণ করতে পারে যা তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে (correlations) ব্যাখ্যা করে।



John Clauser used calcium atoms that could emit entangled photons after he had illuminated them with a special light. He set up a filter on either side to measure the photons' polarisation. After a series of measurements, he was able to show they violated a Bell inequality.

© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

সেই শেষোক্ত লুপ হোলকে সত্যিকার অর্থে বন্ধ করার একমাত্র উপায় হল দুটি এনট্যাঙ্গল হওয়া কণা তৈরি করা, তাদের জোড় বজায় রেখে খুব বড় দূরত্বে আলাদা করা এবং তারপরে একই সাথে যতটা সম্ভব কাছাকাছি তুলনামূলক পরিমাপ করা। এই ঘটনাটি বিখ্যাত আলোক শঙ্কুর (light-cones) বাইরে দুজন পৃথক পর্যবেক্ষককে রাখে। এর ফলে নিশ্চিত হয় যে দুটো আলাদা পরিমাপ কখনোই একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারে না।

শুধুমাত্র যদি প্রতিটি পর্যবেক্ষকের পরিমাপ তাদের মধ্যে যোগাযোগের কোন সম্ভাবনা ছাড়াই (উপরে উল্লেখিত অদেখা সংকেত সহ) একে অপরের থেকে সত্যিকারের

স্বাধীন হতে পারে তখনই বিজ্ঞানীরা লোকাল, বাস্তব লুকানো ভেরিয়েবলের চূড়ান্ত লুপ হোলটি বন্ধ করতে পারবেন। সেখানেই এই বছরের তৃতীয় নোবেল প্রাপক, অ্যান্টন জেইলিংগারের কাজটি কার্যকর হয়। [তথ্যসূত্র 4 দ্রষ্টব্য]

জেইলিংগার এবং তাঁর সহযোগীরা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সাহায্যে কাজটি সম্পন্ন করেন।

প্রথমত, তারা লেজারের আলোর সাথে একটি ডাউন-কনভার্সন ক্রিস্টাল পাম্প করে এক জোড়া এনট্যাঙ্গল হওয়া ফোটন তৈরি করেছিলেন।

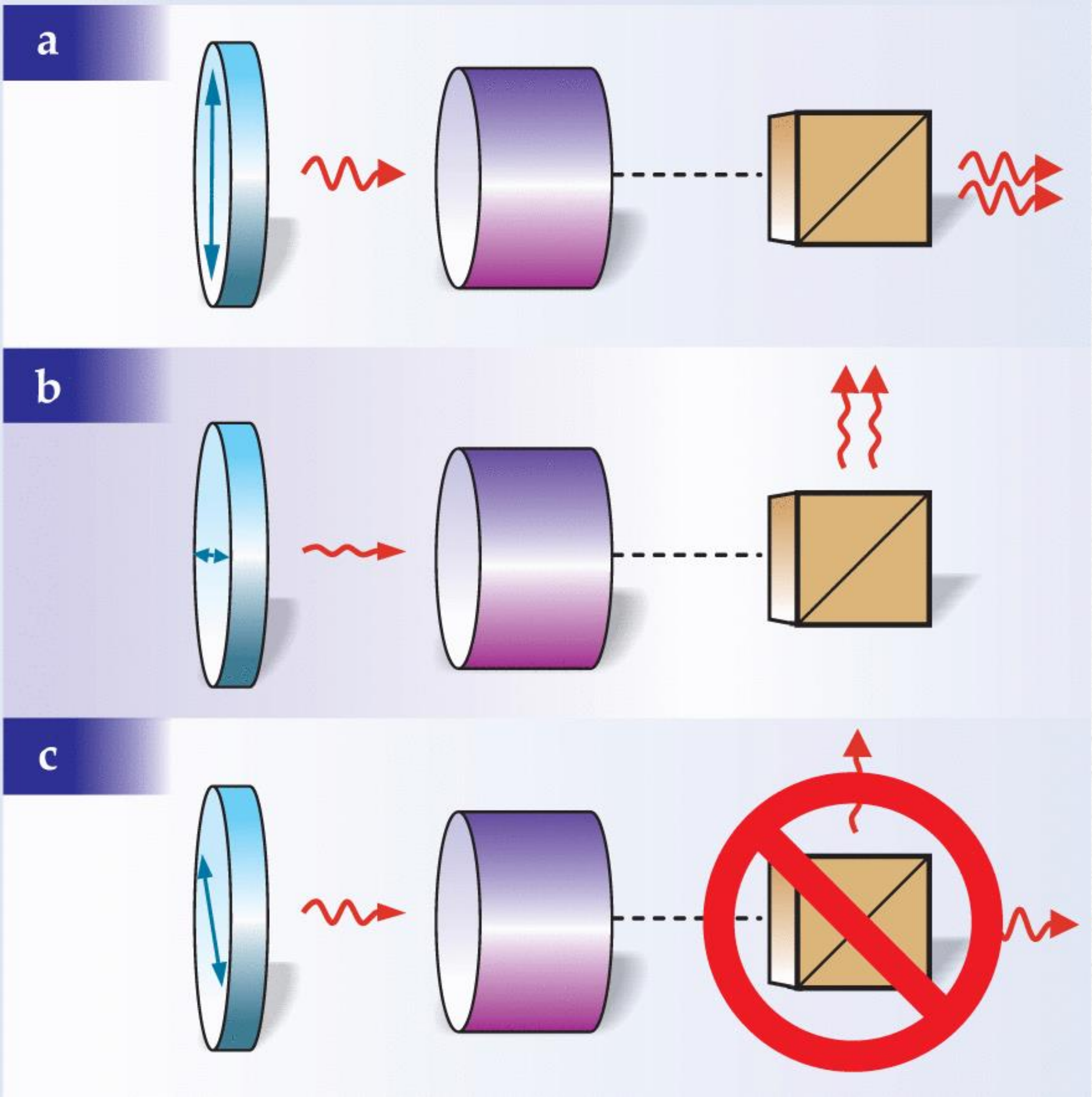
তারপরে, তারা ফোটন জোড়ার প্রতিটি সদস্যকে একটি পৃথক অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে এনট্যাঙ্গল হয়ে থাকা কোয়ান্টাম দশাকে সংরক্ষণ করে প্রেরণ করেছিলেন।

এর পরে, তারা দুটি ফোটনকে প্রাথমিকভাবে প্রায় 400 মিটার ব্যবধানে রেখেছিলেন। পরে তাদের আরও এমন দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যাতে তাদের মধ্যে আলোর ভ্রমণের সময় এক মাইক্রোসেকেন্ডের চেয়ে দীর্ঘ হয়।

এবং অবশেষে, তাঁরা প্রতিটি পরিমাপের মধ্যে দশ ন্যানোসেকেন্ডের ক্রম অনুসারে (দশ, একশো, এক হাজার এইভাবে) সময়ের পার্থক্য সহ পরীক্ষাটি সম্পাদনা করেছিলেন।

তাঁরা এই পরীক্ষাটি 10,000 বারের বেশি সম্পাদন করেছিলেন। তার ফলে এতো বেশি শক্তিশালী পরিসংখ্যান তৈরী হয়েছে যাতে সেই "অদৃশ্য সংকেত" (unseeable signal) টির লুপ হোল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে এর পরবর্তী অন্য পরীক্ষাগুলি দুটো এনট্যাঙ্গল হয়ে থাকা ফোটনের দূরত্বকে কয়েকশত কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। ধীরে ধীরে আমাদের প্রযুক্তি এতো বেশি উন্নত হয়ে উঠছে যে সম্প্রতি হয়ে যাওয়া একটা পরীক্ষাতে এনট্যাঙ্গল হয়ে থাকা একটি ফোটন ভূপৃষ্ঠে এবং অন্য ফোটনটি কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে মহাকাশে থেকে আমাদের চারিদিকে পাক খাচ্ছে! [তথ্যসূত্র 5 দ্রষ্টব্য]

বিজ্ঞানী জেইলিংগার আরও একটি বিখ্যাত পরীক্ষার সম্পাদনা করেছিলেন যাতে তিনি এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে অদ্ভুত কোয়ান্টাম ঘটনাগুলির একটিকে সক্ষম করেছিল, তা হলো কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন। একটি বিখ্যাত কোয়ান্টাম নো-ক্লোনিং উপপাদ্য (quantum no-cloning theorem) রয়েছে, যা নির্দেশ করে যে আপনি মূল কোয়ান্টাম দশাকে ধ্বংস না করে একটি নির্বিচারে (arbitrary) কোয়ান্টাম দশার একটি অনুলিপি তৈরি করতে পারবেন না।



বিজ্ঞানী Francesco De Martini এর গ্রুপের সাথে জেইলিংগারের গ্রুপ মিলেমিশে এনট্যাঙ্গেলমেন্ট অদলবদল করার একটি ঘটনা পরীক্ষামূলকভাবে দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই পরীক্ষাতে দেখা যায় একটি কণার সঙ্গে এনট্যাঙ্গেলমেন্টে জড়িয়ে থাকা অবস্থাতেও অন্য একটি দ্বিতীয় কণার কোয়ান্টাম দশা কার্যকরভাবে একটি ভিন্ন তৃতীয় কণার মধ্যে "সরানো" যেতে পারে। যেখানে তৃতীয় কণাটির সাথে প্রথম কণাটির কোনো ভাবেই সরাসরি যোগাযোগ নেই! [তথ্যসূত্র - 6 দ্রষ্টব্য]

বস্তুত কোয়ান্টাম ক্লোনিং এখনও অসম্ভব, কারন মূল কণার কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষণ করা হয়নি। তবে সেই

পরীক্ষাতে একটি কোয়ান্টাম সংস্করণ নিশ্চিতভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। যা অবশ্যই অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা নোবেল পাওয়ার যোগ্য।

এই বছরের নোবেল পুরস্কার কেবল একটি ফিজিক্যাল কৌতূহল নয়, যা আমাদের কোয়ান্টাম বাস্তবতার প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু গভীর সত্য উন্মোচন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। Clauser, Aspect, এবং Zeilinger-এর গবেষণার কারণে আমরা এখন বুঝতে পারি যে এনট্যাঙ্গলমেন্ট কণাগুলি কোয়ান্টাম রিসোর্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যা সেটিকে যথেষ্ট দীর্ঘ সময় জুড়ে ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহার করতে সক্ষম করে।

কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট অনেক বড় দূরত্বের উপর ঘটতে পারে, যা যথেষ্ট বড় দূরত্বে কোয়ান্টাম তথ্যের মাধ্যমে যোগাযোগের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। Quantum repeaters, কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক উভয়ই এখন সেই কাজটি সঠিকভাবে করতে পারে। এছাড়াও বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত (controlled) এনট্যাঙ্গলমেন্ট কেবল দুটি কণার মধ্যে নয়, অনেকগুলো কণার মধ্যে সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে condensed matter এবং multi-particle systems এর কথা বলা যায়। এবং এই প্রক্রিয়াগুলি চলবে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের

ভবিষ্যৎবাণীগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে, লুকানো পরিবর্তনশীল তত্ত্বগুলির সাথে নয়। অবশেষে উল্লেখ করা যায় একটি বেল-অসমতা লঙ্ঘনকারী পরীক্ষা দ্বারা সংঘটিত কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফির কথা, যা জেইলিঙ্গার নিজেই পরীক্ষাটি করেছিলেন।



2022 সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী জন ক্লজার, অ্যালাইন অ্যাসপেক্ট এবং অ্যান্টন জেইলিংগারকে জানাই শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক অভিনন্দন।

তাঁদের জন্যই কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট আর কেবল একটি তাত্ত্বিক কৌতূহল নয়, বরং একটি শক্তিশালী হাতিয়ার যা আজকের প্রযুক্তির অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সরোজ নাগ

চিত্র পরিচিতি –

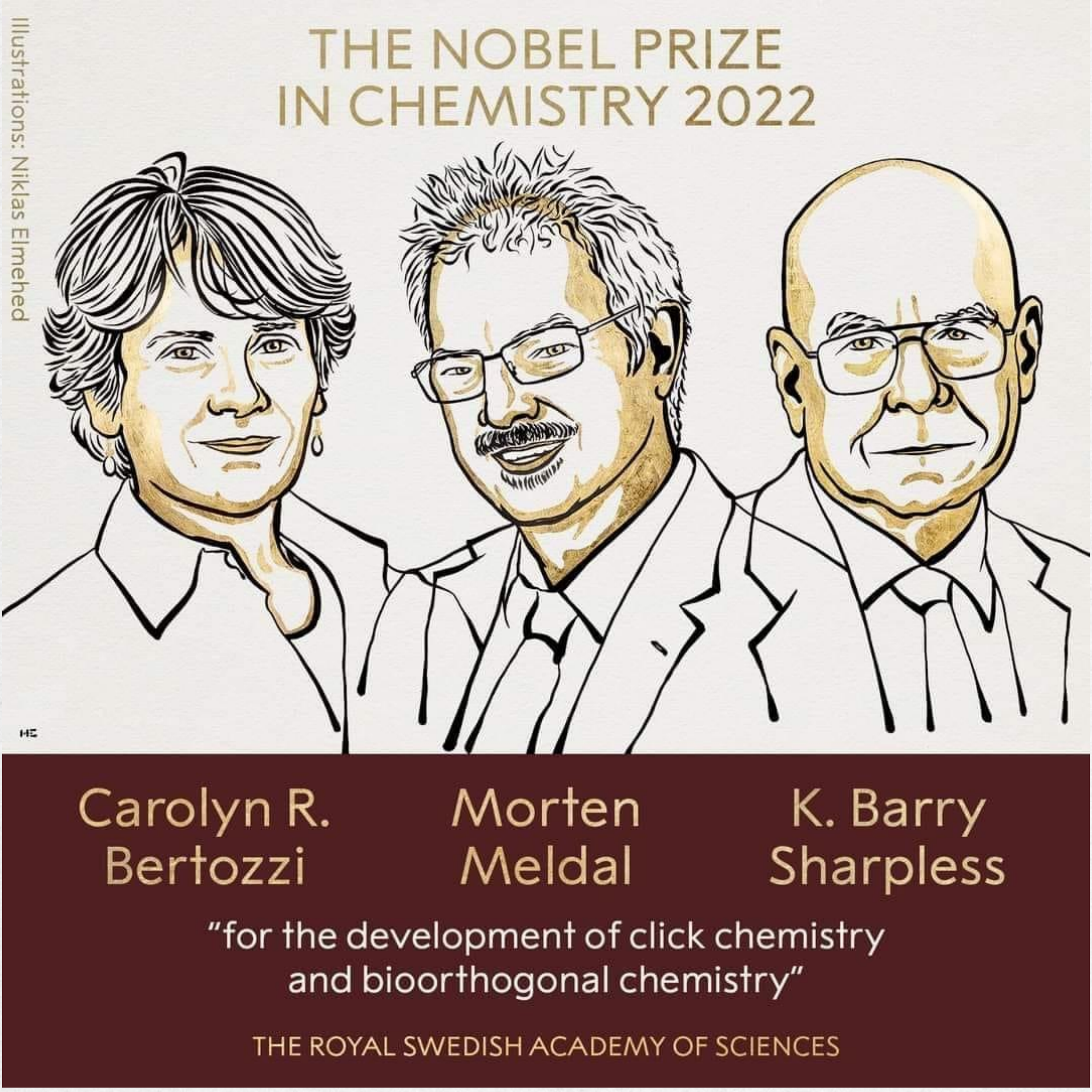
চিত্র 1ঃ পদার্থবিজ্ঞানে 2022 সালের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী ত্রয়। বাম দিকে Anton Zeilinger, মাঝে John F. Clauser এবং ডান দিকে Alain Aspect. সৌজন্যে CNN

তথ্য সূত্র --

1) van Leent, T., Bock, M., Fertig, F. et al. Entangling single atoms over 33 km telecom fibre. Nature 607, 69–73 (2022).
https://doi.org/10.1038/s41586-022-04764-4
2) Basic Theory of Quantum Entanglement and the Possibility of Passing on Information Faster than the Speed of Light, Yihe Xue 2021 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 658 012001
https://iopscience.iop.org/.../10.../1755-1315/658/1/012001
3) Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers
Alain Aspect, Jean Dalibard, and Gérard Roger, Phys. Rev. Lett. 49, 1804 – Published 20 December 1982
DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.1804
4) Violation of Bell's Inequality under Strict Einstein Locality Conditions
Gregor Weihs, Thomas Jennewein, Christoph Simon, Harald Weinfurter, and Anton Zeilinger, Phys. Rev. Lett. 81, 5039 – Published 7 December 1998
DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.81.5039
5) Entanglement demonstration on board a nano-satellite, Optica Vol. 7, Issue 7, pp. 734-737 (2020)
https://doi.org/10.1364/OPTICA.387306
6) Experimental Entanglement Swapping: Entangling Photons That Never Interacted, Jian-Wei Pan, Dik Bouwmeester, Harald Weinfurter, and Anton Zeilinger, Phys. Rev. Lett. 80, 3891 – Published 4 May 1998
DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.80.3891

রসায়ন নোবেল পুরস্কার ২০২২

- শ্রুতি সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়



ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার হলঘরে বসে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা দিচ্ছে। আপনি পরীক্ষা-নিয়ামক। নিয়ম অনুযায়ী, উপস্থিত প্রতিটি পরীক্ষার্থীর সই নিয়ে রাখতে হবে নির্দিষ্ট কাগজে। এবং এই কাজটা করতে হবে পরীক্ষা চলাকালীনই আর ওদের পরীক্ষাকে কোনোভাবে বিঘ্নিত না করে। প্রয়োজন যেহেতু আছে, তাই আপনার এই কাজটা চলবে পরীক্ষা-

ব্যবস্থার সঙ্গে একই সাথে, কিন্তু সমান্তরালে নয়। সমান্তরালে চলছে, এমন বললে এটা আলাদা কোনো পরীক্ষা বলে বোঝাতে পারে। আর তাই বিজ্ঞানের ভাষায়, যা মূলপদ্ধতির সঙ্গে সমান্তরালে চলছে না, তার চলাচল মূল পদ্ধতির সঙ্গে অভিলম্ব বরাবর, নব্বই ডিগ্রি কোণ করে। গ্রীকভাষা থেকে গৃহীত শব্দানুযায়ী, এমন দুটো পদ্ধতিকে একে অপরের 'অর্থোগোনাল' (orthogonal) বলা হয়।

এখন এই দুই অর্থোগোনাল পদ্ধতির সঙ্গে আমরা রসায়নের কিছু বিক্রিয়ার তুলনা করব। কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া মানুষ নিজের ইচ্ছায় ল্যাবরেটরিতে ঘটাতে পারে। বিরাট সংখ্যক রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রতিদিন প্রতি মূহুর্তে কোষে কোষে ঘটিয়ে চলেছে প্রকৃতি আপন-খেয়ালে। কখনো কখনো সভ্যতার অগ্রগতির স্বার্থে আমরা সেইসব কোষীয় বিক্রিয়ার ফলাফলের সুযোগ নিই। এই যেমন ধরুন ইস্ট দিয়ে ফার্মেন্টেশন ঘটানো, প্রাকৃতিক উৎসেচকের সাহায্যে ওষুধ তৈরির কয়েকটা ধাপ এগিয়ে নেওয়া, এইরকম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোষের মধ্যে থাকা মালমশলার যদি সামান্য একটু পরিবর্তন ঘটানো যায় তবে তার ফলাফলটা বেশ ভালো করে কাজে লাগানো যাচ্ছে। প্রাকৃতিক উপায়ে বিক্রিয়া চালালে হয়ত যতটা জিনিস আমাদের চাই, যেভাবে চাই, ততটা সেভাবে পেতাম না। তখন দরকার প্রাকৃতিক মালমশলার উপরে এঞ্জিনিয়ারিং করার। তার জন্য ল্যাবরেটরিতে ফ্লাস্কের মধ্যে আমরা

তেমন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে দেখি, তেমনটা ঘটাতে হবে জ্যান্ত কোষের মধ্যে, তার সবরকম জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া চলাকালীন।

এখন প্রথম অনুচ্ছেদে আরেকবার ঘুরে আসুন। মূল পরীক্ষার জায়গায় আপনি যদি আমাদের কোষে ঘটে চলা জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া রাখেন এবং ছাত্রছাত্রীদের ঐ সই করার পদ্ধতির বদলে ল্যাবরেটরিতে ফ্লাস্কে ঘটানো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার পদ্ধতিকে চিন্তা করেন, তবেই ঐ এঞ্জিনিয়ারিং, যাকে বলে কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং, সেইটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করানো যাবে।

অর্থাৎ কোষের বিক্রিয়া আর মানুষের ঘটানো বিক্রিয়া একে অন্যের অর্থোগোনাল হওয়া চাই। দুটোই যেন স্বাধীনভাবে ঘটানো যায়, কেউ কাউকে প্রভাবিত না করে। জীবন্ত কোষে ঘটানো এই এঞ্জিনিয়ারিং বিক্রিয়াটারই আরেকটা নাম, বায়ো-অর্থোগোনাল বিক্রিয়া।

তার মানে ছাত্রছাত্রীরা যখন পরীক্ষা দিচ্ছে, তখন তাদের দিয়ে সই করানোর পদ্ধতিটা হতে হবে এক ধাপের, এক পাতার, একটা সইয়ের। বারবার বিভিন্ন পাতায় বিভিন্ন স্থানে যদি তাদের স্বাক্ষর নিতে যাই, তবে তাদের মনঃসংযোগ নষ্ট হতে পারে। একই ব্যাপার খাটে রাসায়নিক

বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে। জীবন্ত কোষে যখন নিজস্ব জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া চলছে, তখন মানুষ সেই কোষের মধ্যে থাকা একটা জৈব যৌগের বিরাট অণুর কিছু গঠনগত পরিবর্তন ঘটাতে চায়। যেমন, তার দরকার বিরাট একটা কোষীয় অণুকে আরেকটা উজ্জ্বল রঙের বাইরের কোনো অণু দিয়ে যুক্ত করা (যাকে ফেসবুকে বলে 'ট্যাগ করা' tagging)। কেন? না, সেরকম করলে সেই অণুটাকে উপযুক্ত মাইক্রোস্কোপ দিয়ে চোখে চোখে রাখার সুবিধা হয়। দেখা যায় যে ব্যাটা কোষ থেকে কোষে কোন রাস্তা ধরে ছোটে। আর এই থেকে অণুটার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বলিষ্ঠ ধারণা মেলে। সেইরকম ট্যাগ করার কায়দাটা হতে হবে এক ধাপের, যাতে ষাঁড়ের মত বড় অণুটা প্রায় বুঝতেই না পারে যে তার গায়ে শালিক পাখির মত ছোট কোনো অণু আটকানো হয়েছে! আর এইখানেই চলে আসে "ক + খ = গ + ঘ" -মার্কা রাসায়নিক বিক্রিয়ার গুরুত্ব।

আমাদের ছোটোবেলার বইতে তীরচিহ্ন দিয়ে যতই লেখা থাক যে 'ক'-এর সঙ্গে 'খ'-এর বিক্রিয়া ঘটালে 'গ' আর 'ঘ' তৈরি হয়, বাস্তবে ল্যাবরেটরিতে ঘটা বিক্রিয়াগুলো এত সহজ হয় না। এক-একটা তীরচিহ্নের খোঁচার পিছনে অন্তত হাজারখানেক রসায়নবিদের সারা জীবনের ঘাম-ঝরানো খাটনি লুকিয়ে থাকে। রসায়নবিদ্যার শুরু থেকে আজ অবধি মানুষ তার নিজের কাজের প্রয়োজনে যত রাসায়নিক বিক্রিয়া আবিষ্কার করেছে, তার সিংহভাগের ফলাফলই

নির্ভর করে বিক্রিয়ার সময়ে উপস্থিত গুচ্ছের শর্তের উপর। চটপট লাল রঙের তরল আর নীল রঙের কঠিন বিক্রিয়া করে সবুজ রঙের গ্যাস আর হলুদ রঙের কঠিন হয়ে গেল, আর কোথাও কোনো গণ্ডগোল হল না; সব জিনিস যত পরিমাণে যেমনটা চাই ঠিক তেমনটা পেলাম, এমন ভাগ্য কদাচিৎ হয়, এমনটা লিখলেও বোধ করি বাড়িয়ে বলা হবে! আগে থেকে বলা মুশকিল কোন্ অবস্থায় কিসের বাড়তি বা খামতিতে কি ফলাফল দেবে। অনেক পর্যবেক্ষণের পরে একটা গড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এই এই পরিস্থিতিতে এই এই ফল আসে, আর সেটাই বিক্রিয়াটার প্রতিষ্ঠিত প্রোটোকল-রূপে বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

একমাত্র এক শ্রেণীর বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মানুষ একটু নিশ্চিন্তে ফলাফল কী হবে তার ঘোষণা আগ বাড়িয়ে করতে পারে। সেটার কারন মানুষের এতদিনের পরমাণু এবং অণু, তাদের রাসায়নিক বন্ধন-সংক্রান্ত গণিত-নির্ভর বিশদ গবেষণা। এই ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অণুর, বিশেষতঃ কিছু জৈব অণুর বাইরের কাঠামো জুড়ে, অণু-গঠনকারী পরমাণুগুলোর মধ্যে ইলেকট্রনের চলাচলের দিক আগে থেকে বলা সম্ভব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটা অণু থেকে আরেকটা অণুতে, বা একটা অণুর মধ্যে, এই ইলেকট্রনের চলাচল যেন গাড়ির একটা চাকার মত বলে মনে হয় - দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, কিন্তু 'যাবে না ফিরে' নয়, ফিরে যাবে।

আর জন্ম নেবে দুটো অণুর সংযোগে নতুন একটা অণু, অথবা একটা অণু বদলিয়ে আরেকটা অণু। এই শ্রেণীর বিক্রিয়ার সাধারণ নাম পেরিসাইক্লিক বিক্রিয়া।

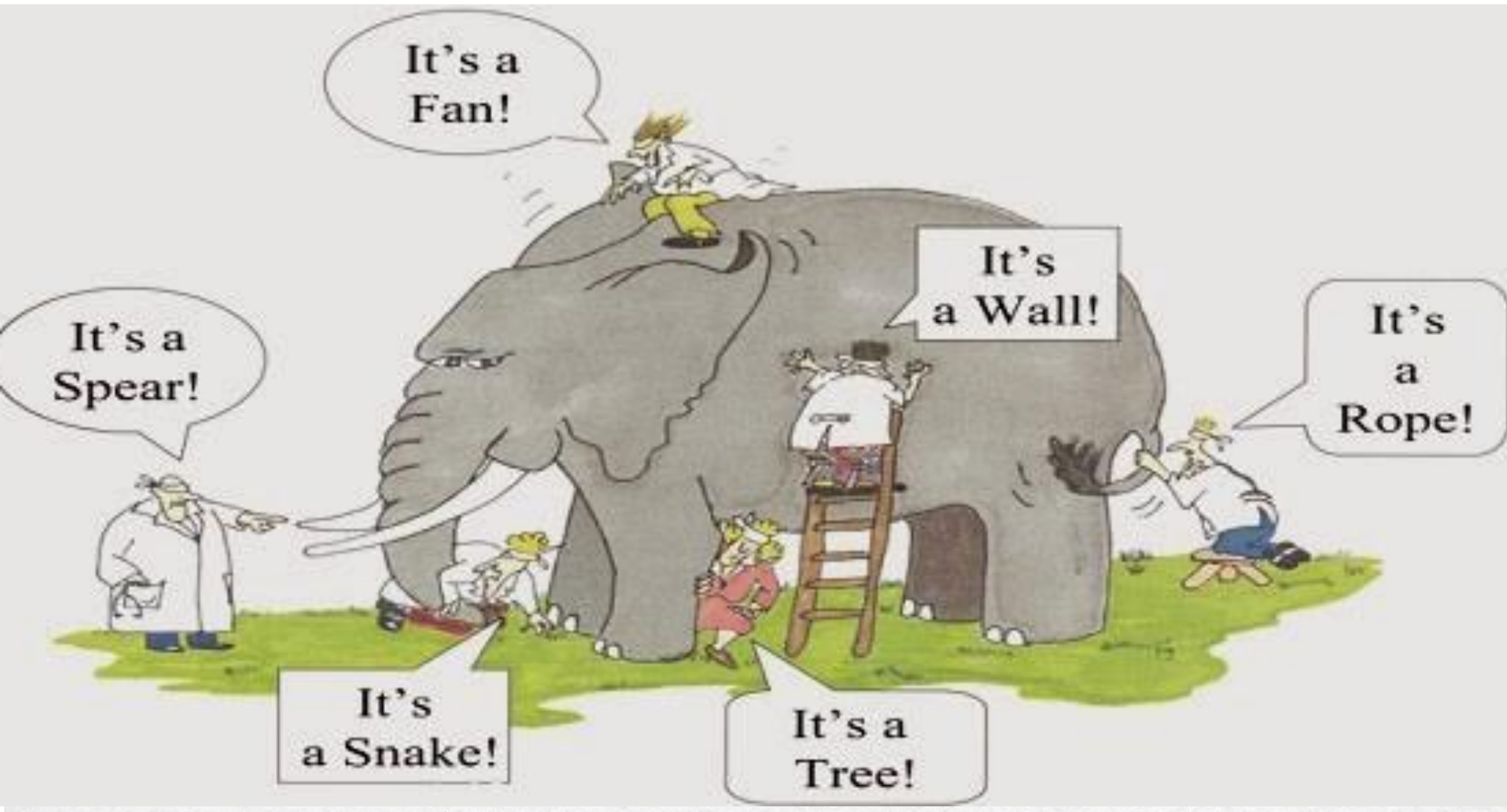
'পেরি', অর্থাৎ কিনা, 'পেরিফেরি' (periphery) বা পরিসীমা, যা বরাবর চাকার মত, অর্থাৎ cyclically, ইলেকট্রনের যাতায়াত ঘটে। এইসব পেরিসাইক্লিক বিক্রিয়ার মজা হচ্ছে, এক ধাপে যা ঘটনা ঘটার ঘটে যায়। তাছাড়া এও দেখা যায় যে একই অণুতে তাপ দিলে ইলেকট্রনের চলাচল যেমন হয়, আলো ফেললে চলাচল ঠিক তার উল্টো রাস্তায় ঘটে। এই পেরিসাইক্লিক বিক্রিয়াগুলোরই বিশেষ একটা রকমফের হচ্ছে ক্লিক রিয়্যাকশন, যেন মাউসের এক ক্লিকে একখানা বিক্রিয়া ঘটানো যায় (অথবা, এখন এও বলা চলে যে সব পেরিসাইক্লিক বিক্রিয়াই আসলে ক্লিক বিক্রিয়া)। ক্লিক বিক্রিয়ায় যেন অণু বা অণুগুলো প্রস্তুত থাকে আগেভাগেই, তারপর নির্দেশ পাওয়া মাত্র 'জো হুজুর ' বলে সেলাম ঠুকে নিজেদের সাজিয়ে নতুনভাবে পেশ করে আমাদের সামনে।

সুতরাং এ বোঝাই যাচ্ছে, বায়ো-অর্থোগোনাল বিক্রিয়া যদি জীবন্ত কোষে ঘটাতেই হয়, তবে তার জন্য ক্লিক-বিক্রিয়া ব্যতীত ভালো বিকল্প আর কিছু নেই। শার্পলেস আর মেন্ডাল

বহু বছর ধরে গবেষণা করে এই ক্লিক-রসায়নের ভিত্তি মজবুত করেছেন। 'ক্লিক-কেমিস্ট্রি' নামটা শার্পলেসেরই 'শার্প ব্রেন' থেকে বেরিয়েছিল বাইশ বছর আগে। আর বার্তোজ্জি এই বিক্রিয়াকে 'বায়ো-অর্থোগোনাল' বিক্রিয়ারূপে জ্যান্ত কোষে কাজে লাগিয়েছেন। 'বায়ো-অর্থোগোনাল' শব্দটা আবার বার্তোজ্জিই প্রথম ব্যবহার করেন। জীবকোষের মধ্যে বিক্রিয়া চালাতে গেলে ল্যাবরেটরির ফ্লাস্কের মত নিয়ম খাটালে তো আর চলবে না। তাই বার্তোজ্জিকেও বহু বছর খেটেখুটে বায়ো-অর্থোগোনাল বিক্রিয়ার শর্তগুলো নির্বাচন করতে হয়েছে।

এখন এবং ভবিষ্যতেও এই শ্রেণীর বিক্রিয়া ঘটিয়ে নতুন জৈব-যৌগ নির্মাণ, শরীরের মধ্যে অনেক অণুর ইমেজিং পদ্ধতি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করা সম্ভব হচ্ছে এবং হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একুশ বছর আগে এই শার্পলেসই অ্যাসিমেট্রিক সিনথেসিস (বিশুদ্ধ জৈব-যৌগ নির্মাণের একপ্রকার পদ্ধতি) আবিষ্কার করে রসায়নে নোবেলজয়ী হয়েছিলেন।



অন্ধদের হাতি দর্শনে হাতি গালগল্প?

-মুজিব রহমান

আমরা পাঁচ অন্ধের হাতি দর্শনের গল্পটি জানি। পাঁচ অন্ধকে হাতি দেখতে গেল। যার হাতে যা ঠেকলো সে সেটাকে ভালমতো উপলব্ধি করলো। সবাই নিশ্চিত হয়েই বলল আরে হাতি হল—

যে হাতির পা ধরেছিল সে বলল, ঠিক খাম্বার মতো। যে লেজ ধরেছিল সে বলল, ঠিক রশির মতো। যে শূঁড় ধরেছিল সে বলল, ঠিক সাপের মতো। যে পেট ধরেছিল সে বলল, ঠিক দেয়ালের মতো। যে কান ধরেছিল সে বলল, ঠিক কূলার মতো। সবাই নিজের দর্শনে অনড়। আলাদা অঙ্গ না ধরলে এই পাঁচটি উপাদান মিলালেও হাতি আসবে না।

কমপক্ষে হাজার বছর আগের ধর্মগ্রন্থগুলোতে একেকটি বিষয়ের বর্ণনা অনেকটাই এরকমই।

পৃথিবী, আকাশ, মানুষ, আত্মা. ইত্যাদি বহু বিষয়ের ব্যাখ্যাগুলো অন্ধের হাতি দর্শনের মতোই।

তখন বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের মানুষও মনে করতো তারাই পৃথিবী, তারাই একমাত্র জনগোষ্ঠী। সে মোতাবেকই আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এমনকি জাপানের আদি বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। মানুষ ব্যাখ্যা তৈরি করতে নিয়ে এসেছে পেট-বানানো গল্প। সেই গল্পগুলোর বিবর্তনও ঘটেছে কালক্রমে।



একটা বিষয় নিশ্চিত যে তারা মনে করতো প্রাণীর দুটো উপাদান। একটি নশ্বর শরীর আরেকটি অবিনশ্বর আত্মা। আত্মার বিশ্লেষণ করতে হলে শরীর কিভাবে সচল থাকে সেটা উপলব্ধির দরকার ছিল। কিন্তু ওই সময় এটা মানুষ বুঝতে শিখেনি। তাই আত্মা নিয়ে একেক গ্রন্থে একেক রকম ধারণা দেয়া হয়েছে। সেমিটিক ধর্মে বলা হয়, 'স্রষ্টা আগেই

আত্মা সৃষ্টি করে রাখে। জন্মের আগে ঢুকিয়ে দেয় গর্ভের শিশুর মধ্যে। স্রষ্টা আত্মা ছিনিয়ে নিলেই মৃত্যু। কবে কখন ও কিভাবে ছিনিয়ে নিবে সেটাও নির্ধারিত। পৃথিবী ধ্বংসের পরে পুনর্জিবীত আত্মার বিচার সভা বসবে'। বৈদিক তথা হিন্দু ধর্মে বলা হয়, 'আত্মা ভাল মন্দের কর্মের জন্য পরের জন্মে কোথায় জন্ম নিবে তা কর্মের দ্বারা নির্ধারিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মে আবার আত্মা ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন প্রাণির মধ্যেও। সৎ কর্ম করলে বা বৌদ্ধ ভিক্ষু হলে আত্মা মুক্তি পায় এবং বিলীন হয়ে যায় যাকে বলে নির্বাণ হওয়া।

আর আজ বিজ্ঞান দেখাচ্ছে কিভাবে জীবন সচল থাকে এবং সেখানে আত্মা অপ্রয়োজনীয়।

অন্তত এক হাজার বছর আগের মানুষ নিজেদের ভূখণ্ডগুলোকেই ভাবত দুনিয়া। জাপানের দ্বীপগুলো যাকে তারা দলতো নিপ্পন বা সূর্যোদয়ের ভূখণ্ড। তারা খবর রাখতো না কোরিয়া বা চীনের। অথচ বহু বছর আছে তারাও ছিল একই ভূখণ্ডে। ফলে শিন্টো ধর্মের পৃথিবী হল ওই নিপ্পন দ্বীপমালা! দেবতারা থাকতো সমুদ্রে। তারা কাদাকেলি করতে করতে সমুদ্রে বিভিন্ন দ্বীপ তৈরি করে। সেটাই পৃথিবী। এমন একটা বিশ্বাসও দেখি না যেখানে বলা হয়েছে পৃথিবী গোলাকার এবং পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

সেমিটিক গ্রন্থে স্রষ্টা ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করে। বাইবেলে একদিন বিশ্রামের কথা আছে। আমরা আজ সপ্তাহে যে

একদিন ছুটি পাই সেটা ওখান থেকেই আসা। স্রষ্টা সমতল পৃথিবীকে শক্ত রাখার জন্য পেরেক মেরেছে পাহাড়গুলো দিয়ে। পৃথিবীর উপর সাতটি আসমান দিয়েছে দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান খুঁটি দিয়ে। দুনিয়া সৃষ্টির হাজারো রকমের ধর্মীয় ব্যাখ্যার একটিও মিলে না আজ।

মানুষ সৃষ্টি নিয়েও হাজারো ব্যাখ্যা। হিন্দু ধর্মের সেই বিরাট পুরুষের কথা জানি যিনি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে সব কিছু তৈরি করেছেন। তার মাথা থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, বুক থেকে বৈশ্য, পা থেকে শূদ্র তৈরি হয়েছে। নাড়িভূড়ি থেকে অন্যসব প্রাণি-উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। সেমিটিক ধর্ম বলে স্রষ্টা নিজে একজন পুরুষ ও একজন নারী সৃষ্টি করেন। স্রষ্টার কথা না শোনায় তিদের স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে পাঠায়। বাকি ধর্মগুলোতে একেকটায় একেক রকম বিশ্বাস। কোনটায় বলা হয়েছে এক দানবের বগলের দুই তলা থেকে একজন পুরুষ ও একজন নারী সৃষ্টি হয়। ওয়াক! কোথাও বলা হয়েছে, দেবতারা দাস তৈরি করতেই মানুষ তৈরি করেন। হাজারো ব্যাখ্যা। আবার মিলগুলোর মধ্যেও প্রভেদ অনেক। আদম-হাওয়া, এডাম-ইভ বা মনু-শতরূপা পুরোপুরি মিলবে না। অথচ বিজ্ঞান বলছে মানুষ এসেছে বিবর্তনের পথ ধরে। ৪৩০০ টি ধর্ম বিশ্বাসের কোনটিতেই সঠিক ব্যাখ্যা মিলে না। আবার ব্যাখ্যাগুলোকে একত্রিত করলেও মিলে না। বিশ্বাসে পাওয়া তথ্যগুলো বিজ্ঞানের চোখে নিছকই গালগল্প!



বাইবেল ও কোরানে মহাবিশ্বের সৃষ্টি

- শ ম্ভু না থ চা র্বা ক

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন যা সাবাতের দিন নামে খ্যাত। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের এই কথা প্রচন্ড ধার্মিক ঈশ্বর বিশ্বাসী খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করেন। যেহেতু সৃষ্টির আগে সূর্যের অস্তিত্ব ছিলনা তাই বোধহয় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হতো না। আর পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির সময়কে দিন (ছয় দিন) ধরে হিসাব করা স্পষ্টত অসম্ভব।

প্রশ্ন হচ্ছে - কেন ঈশ্বর মানুষের আবিষ্কার করা সময়ের মাপদণ্ড দিয়ে তার সৃষ্টির সময়কে হিসাব করবেন? কেন তিনি পৃথিবী নামক গ্রহের সময়কে একক ধরে হিসেব

করবেন? অন্যান্য দূরবর্তী গ্রহ ইউরেনাস বা নেপচুনের সময়কে একক হিসেবে ধরবেন না? ঈশ্বর সূর্য ও পৃথিবী সৃষ্টি করার আগের সময়ে দিন ও রাত কিভাবে সংঘটিত হতো?

মহাবিশ্বকে ছয়দিনে সৃষ্টি করার কথা কোরানে কমপক্ষে আটবার আছে। এছাড়া আরবী শব্দ আরশ কথাটির অর্থ রাজসিংহাসন বিভিন্ন আয়াতে (৭:৫৪/২৫:৫৯/১১:৭/২৩: ৮৬-৮৭, ১১৬/৩২:৪) আল্লাহর আরশে বসার কথা বলা হয়েছে।



প্রশ্ন হচ্ছে – নিরাকার আল্লাহ কি করে আরশে বসেন? নিরাকার জীব আল্লাহকে কেন আরশে বসতে হব? কোরানে স্পষ্ট বলা হয়েছে আল্লাহর আরশ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির আগে পানির ওপর ছিল। তাহলে পৌত্তলিক আরবীয়ানদের

আল্লাহই কি নবির আল্লাহ? নবির বাবার নাম ছিল আবদুল্লাহ, এর অর্থ আল্লাহর দাস এবং আবু লাহাবের নাম ছিল আব্দুল ওজ্জা যার অর্থ ওজ্জা দেবীর দাস। আর আকাশ পৃথিবী সৃষ্টির আগেই আল্লাহর আরশ পানির ওপরে ছিল মানে কি? (সুরা ইউনুস – আয়াত ৩ ও সুরা আরাফের আয়াত ৪৪)। পৃথিবী সৃষ্টির আগে পানি আসে কোথা থেকে? এটা সম্ভবত বাইবেলের কপি পেস্ট। এদিকে আল্লাহ নিজেই বলেছেন – আমি আকাশ পৃথিবী এবং দুইয়ের মধ্যবর্তী সব ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি। ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি (সুরা কাফ –আয়াত ৩৮)। তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহরও নিশ্চয় ক্লান্তি আসে? এই আয়াতটি সত্যি বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বাইবেলে সপ্তম দিন অবশ্য বিশ্রামের দিন বলা হয়েছে। নীচে মহাবিশ্ব সৃষ্টি সংক্রান্ত সুরা ও আয়াতের কিছু কিছু তুলে দিলাম যা বর্তমান কালে শুধুই হাসির উদ্রেক করবে।



১) তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। সুরা ইউনিস, আয়াত - ৭)

২) যখন তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল তখন তিনিই আকাশ ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন। (সুরা হুদ - ৭)

মনে প্রশ্ন জাগে - আকাশ জমিন সৃষ্টির আগেই সিং হাসন ও পানি কি করে ছিল?

৩) আমি আকাশ পৃথিবী এবং দুইয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি, ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি (সুরা কাফ - ৩৮)

এই আয়াতটি বিস্ময়কর ছেলে-মানুষি, সর্বশক্তিমান নিরাকার আল্লাহকে এ ধরণের বালখিল্লের মতো পরিচয়জ্ঞাপন বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়।

৪) বল তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবে, যিনি দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; আর তোমরা তার সমকক্ষ দাঁড় করাবে।(সুরা হামিম সিজিদা-৯)

৫) তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন ও সেখানে কল্যাণ রেখেছেন-(৪১:১০)

৬) তারপর তিনি আকাশের দিকে মন দিলেন, আর তা ছিল ধোঁয়ার মত। তারপর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন তোমরা কি স্বেচ্ছায় আসবে না অনিচ্ছায় - (৪১:১১)

৬) তারপর তিনি আকাশকে সাত আকাশে পরিণত করলেন আর প্রত্যেক আকাশকে তার কাজ বুঝিয়ে দিলেন(৪১:১২)। এই আয়াতে অতিরিক্ত দুটি দিনের কথা বলা হয়েছে যা আকাশকে সজ্জিত করার জন্য ব্যয় হয়েছে।

- এই আয়াত কোরানের ছয় দিনের সাথে সাংঘর্ষিক। এত বিশৃঙ্খলা সবজান্তা আল্লাহর কাছে আশা করা যায় না। সুরা তওবার দিনপঞ্জি সংক্রান্ত আয়াতটিও বড্ড গোলমেলে

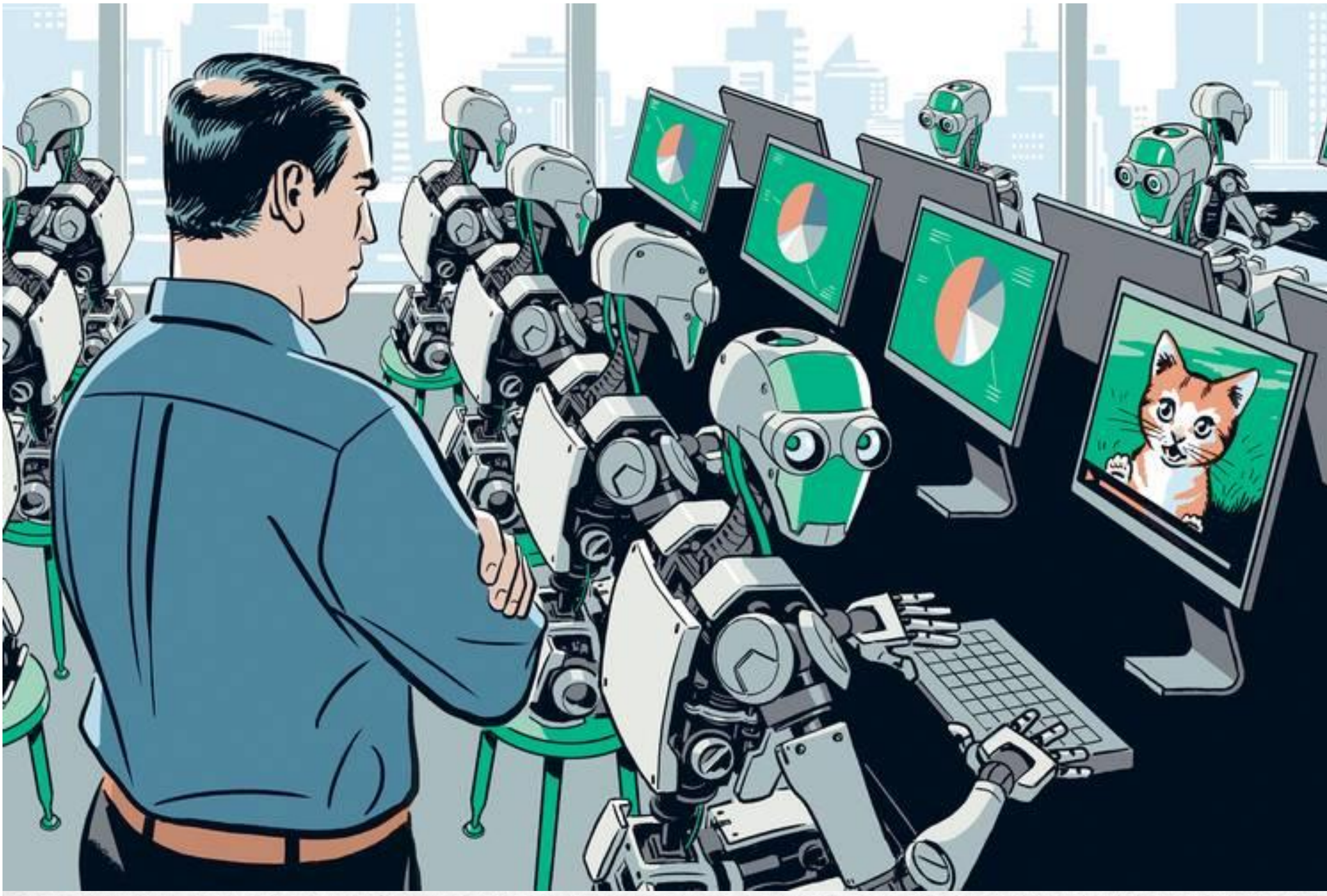
আবার একটি আয়াতে বলা হয়েছে যে – অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে আকাশ ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল? তারপর আমি উভয়কে পৃথক করলাম (সুরা আম্বিয়া ৩০) একে অনেক ইছলামিক পণ্ডিত বিগ ব্যাং থিওরী বলে চালাতে চায়। এরা জানেনা যে বিগ ব্যাং এর হাজার কোটি বছর পরে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে।

সব ধর্মগ্রন্থেই এইরকম গ্যাজাখুড়ি আছে।

তবে ধর্ম মোহে আক্রান্ত কিছু ধীমান

মানুষের গোল গোল ব্যাখ্যা আজ আর সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না।

এই গোঁজামিল থাকাই স্বাভাবিক, কারন তখনকার দিনের লোকদের হাতে উন্নত টেলিস্কোপ ছিলনা আর মহাকাশ বিজ্ঞানের এত প্রসার ঘটেনি। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ঘটনাতেও এই জলের কথা বলা আছে সেটা অনেকদিন আগেই আমি পোস্ট দিয়েছিলাম। আর কোরানের বাক্যগুলি এমনই যে কোনটা কে বলেছে সেটা না বুঝতে পারার মতো নয়। নবি হজরত মুহাম্মদ এই ব্যালেন্সটা রাখতে পারেননি। বেশ কিছু আয়াতে তিনি ধরা পড়ে গেছেন যে এগুলি ওনারই বক্তব্য।



লক্ষী, গনেশ, কার্তিক, সরস্বতী-র ভবিষ্যত বা ভবিষ্যতের লক্ষী, গনেশ, কার্তিক, সরস্বতী

-রাহুল কর্মকার

প্রথমে সবাইকে দুর্গাপুজোর আন্তরিক ও হার্দিক শুভেচ্ছা। পুজোর এই কটা দিন একটু অন্যরকম আমাদের সবার কাছে। দৈনন্দিন অফিসের কাজের চাপ নেই, পরিবারের সকলের সাথে পূর্ণাঙ্গ সময় বিচরণ। তারই একটি ছোট্ট অংশ হল মন্ডপে মন্ডপে প্রতিমা দর্শন।

এই প্রতিবেদনের উৎপত্তি সেরকমই এক সন্ধিক্ষণে। সেজে-গুজে চোখে চশমা এটে দিব্যি সুন্দর এই মন্ডপ থেকে ওই মন্ডপে ঘুরছি। সাথে বৌ আর একমাত্র পুত্র।

প্রবাদ আছে খালি মাথা শয়তানের বাসা, যেহেতু অফিসের কচকচানি নেই, তো মাথা মোটামুটি খালি, আর বৌ সঙ্গে থাকলে তো মাথা খালি রাখতেই হয় (অরন্যের প্রাচীন প্রবাদ)। তো, অতিরিক্ত ফাঁকা মাথা পেয়ে সেই শয়তান ভর করলো।

কোনোও এক মন্ডপে হঠাৎ চোখটা কেমন ঝাপসা হয়ে গেল, দুর্গার মুখটা পালটে বৌ এর মুখ হয়ে গেল। আমি তারাতাড়ি নিজের আইডেন্টিটি জোগার করতে শিব খুঁজতে লাগলাম। ভবিত-ভব, উনাকে যে এই দূর্বল মুহুর্তে দেখার ক্ষমতা হারাব সেই বোধগম্যতাও আমার খালি মাথা থেকে উধাও। ইতি-উতি তাকাতেই অসুর ব্যাটার দিকে চোখ গেল। ওমা, কি সুন্দর আমার মুখমন্ডলের প্রতিচ্ছবি। তৎক্ষনাৎ আকাশবাণী ভেসে এল মূর্খ, মেয়েরা বিয়ের আগে আমার মত বর চায়, কিন্তু বিয়ের পরে অসুর বধ করতেই ভালোবাসে। আমি আকাশপানে চাইতেই দেখি জটাধারী মিটমিট করে হাসছেন। কি আর করা যাবে, ঐশ্বরিক বাণী তো মাথা পেতে বরণ করে নিতেই হয়। অগত্যা দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলাম। দেখা যাক আর কাকে কাকে দেখতে পাই। জৈবিক সুত্র মেনেই যে কার্তিকের মধ্যে সন্তানকে দেখতে পাব সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এতক্ষন যা বললাম তা আসলে সৌজন্যমূলুক ভূমিকা, মূল প্রতিবেদনের সাথে সাজুজ্য খোঁজা বাতুলতা হবে। আসলে

আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত বাবার মত আমিও সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে কিছুটা চিন্তিত তো বটেই।

গোদের উপর বিষ ফোঁড়া অর্থনৈতিক বেহালতা আর নিয়ন্ত্রণহীন মুদ্রাস্ফীতি। একদম সরল ঐকিক নিয়মের সুত্র মেনে চললে আমরা প্রতিনিয়ত গরিব হচ্ছি।

গত পাঁচ বছরের গড়পড়তা মুদ্রাস্ফীতির হার পাঁচ শতাংশ ছিল, আমাদের (মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবি বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী) আয় কি সমহারে বেড়েছে? উত্তরটা না এবং না। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির সাথে দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, সোজাসাপ্টা আমাদের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেড়েছে, মানে প্রতিনিয়ত গরিব হয়েছি, হচ্ছি এবং হব। একটু অংকের



হিসেবে আসা যাক, অর্থনীতির মানদণ্ডে সঞ্চয় ও ব্যয়ের অনুপাত ৭০:৩০ হলে তা সচ্ছল আয় হিসাবে ধরা হয়।

অর্থাৎ ১ লক্ষ টাকা আয় হলে ৩০ হাজার টাকা সাংসারিক জীবনে খরচ করা যেতে পারে। এবার নিজের নিজের যোগবিয়োগ করে দেখুন কি ফলাফল আসছে (যৌথ পরিবারে এক ভাই সবজি বাজার, অন্য ভাই মুদিখানার টাকা দেয় বা বাবার পেনশনের থেকে ইলেক্ট্রিক বিল টা মিটে যায়- এজাতীয় গুলো দয়াকরে হিসাব বহির্ভূত ভাববেন না)।



হিউম্যান লেবার জাতীয় কাজের পরিসর ক্ষুদ্র হচ্ছে টেক্নোলজির কল্যানে এবং এটা অবশ্যম্ভাবী। সাউথ কোরিয়া গভমেন্ট রোবোট-ট্যাক্স এর প্রচলন করেছে। যেসব ইন্ডাস্ট্রি ম্যানুফ্যাকচারিং বা সার্ভিস রিলেটেড কাজ মানুষের বদলে রোবোট দিয়ে করাচ্ছে তারা এই ট্যাক্স দেবে।

মোদ্দা কথা নিকট ভবিষ্যতে তথাকথিত ক্লারিক্যাল কাজের দায়ভার মানুষের হাতে থাকবে না। একদম বোধগম্য উদাহরণ দিচ্ছি।

ডিজিটাল ক্যামেরা আসাতে রিলের ক্যামেরা জাদুঘরে স্থান পেয়েছে। কোডাক নামটাই ইতিহাস হয়ে গেছে যেকিনা একদা ছবির জগতে মুকুটহীন সম্রাট ছিল। মোবাইলের ক্যামেরায় এ-আই এতটাই উন্নত যে এখন আর ফটোসপের দোকানে গিয়ে বলতে হয়না মুখটা আরেকটু ফর্সা করে দাও বা পেছেনের টা ব্লার করে দাও ইত্যাদি। কি মনে হয় আগামি পাঁচ বছর পরে ফটোসপের দোকানের কোনো গুরুত্ব থাকবে?

আগে মোবাইলের দোকান গুলো গান ডাউনলোড বা রিচার্জ কুপন বিক্রি করেও মুনাফা করত, এখন তারা হয় ব্যবসা পাল্টেছে নয় মাছি তাড়াচ্ছে।

কোন কোন পরিসরে কতটা করে কাজ হ্রাস পাবে তার পুংখানুপুংখ বিবরণ না পেলেও এটুকু অনুধাবন করতে পারি বিশ্বের সমগ্র কাজের ৫০% এর বেশি কাজ মানুষকে বাদ দিয়েই সম্পন্ন হবে। এবং সেটা তোমরা যতটা ভাবতে পারছো তার থেকে একটু বেশিই। আমরা কি করতে পারি?

আন্দোলন!! মানুষকে কর্মহীন করার বিজ্ঞানের অমানবিক পদক্ষেপকে থামানোর আন্দোলন। অনেকদিন আগে এই বংগেই এমন আন্দোলন হয়েছিল, দশ বছর পরে ঘুম ভাংগে মানুষের। তাই আমরা আজও বেংগালুরু হয়ে উঠলাম না সমস্ত পোটেনশিয়ালস থাকা সত্ত্বেও। বিজ্ঞানের চাকা রুদ্ধ করে উন্নতি হয় না, উন্নতির ভিত্তিই দাঁড়িয়ে আছে বিজ্ঞানের উপর।

তাহলে? বাকি যেটুকু কাজের পরিসর আছে সেখানে আমার সন্তান ফিট বসবে কিভাবে? লেটস গো ফর বেস্ট স্কুল, বেস্ট এডুকেশন, বেস্ট ব্লা ব্লা... সত্যিই কি তাই? যদি ধরেও নিই তাই তাহলেও কি আমাদের আয় সেটার সংগতি দেবে?

এবার আরেকটু আর্থসামাজিক জটিলতায় ঢুকব। পৃথীবির সমস্ত দেশের পরিচলন পদ্ধতিকে মোটা দাগে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক-পুঁজিবাদি গনতন্ত্র, দুই-মুখোশে ঢাকা একনায়কতন্ত্র।

সত্যি বলতে কি এর বাইরে আর যা কিছু বলা হয় সেগুলো শুধুমাত্র প্রচার স্বার্থে। ভারত নির্দ্বিধায় প্রথম ক্যাটেগরিতে আসে। পুঁজিবাদি গনতন্ত্রের চালিকাশক্তি বৃহৎ পুঁজিপতিরাই, তাতে যতই জনগনের সরকার বলে ঢক্কানিনাদ করা হোক। তোমার আমার ট্যাক্সের টাকা থেকেই করপোরেট সাবসিটি

দেওয়া হয় যার বাজারি নাম এনকারেজ ফর ইন্ডাস্ট্রিয়ালাজেশন। ক্রনি-ক্যাপিটালিসমের সদব্যবহারে ধনকুবের আরও ধনবান হবে, গরিব আরও গরিব হবে।

কাজেই আদানি বিশ্বের ৩য় ধনকুবের হলেও গড় মাথাপিছু আয় নিম্নগামী রেখাতেই ধাবমান হতে থাকবে। কিন্তু এখানেও একটা টুইস্ট আছে।

আমরা যদি এতই গরিব হয়ে যায় যে বাড়ি বানানোর সিমেন্ট কেনার পয়সাও নেই, তাহলে আদানির ব্যবসা কিভাবে হবে?



বা এত গরিব হয়ে গেলাম যে ফোন রিচার্জ করাটাও নেসেসারি খরচের তালিকা থেকে বাদ দিতে বাধ্য হলাম, তাহলে আম্বানি-বিড়লা দের ব্যবসা দেবে কে? কাজেই একটা ব্যালেন্সের প্রয়োজন। যাতে ধনকুবেরদের মুনাফায় টান না পরে, আবার জনগনের ক্রয় ক্ষমতাতেও টান না

ধরে। টেক্নোলজি যে গতিতে ধাবমান তাতে এই ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়ে যাবে বলেই বিশেষজ্ঞদের মতামত। এর প্রতিরোধে বিভিন্ন থিয়োরি উঠে আসছে যা নোবেল পেতে সহায়তা করতে পারে, কিন্তু প্রয়োগের দিক থেকে কতটা উপযোগী তা আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের অন্তরায়।

যেটুকু বোধগম্য হয়েছে তা হল - আগামি ২০ বছরে প্রযুক্তি যে সুনামি নিয়ে আসছে তাতে ভবিষ্যত প্রজন্মে তারাই ভেসে থাকবে যারা বিষয়ভিত্তিক সৃজনশীল দৃঢ়চেতা।

বাকি খড়কুটোর মতই ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমরা অনেকেই আছি যারা জীবনের জোয়ার-ভাঁটা দেখেছি, অভিজ্ঞতা দিয়ে তা সামলাতেও শিখেছি। কিন্তু ওটা সুনামি, ওখানে আমাদের অভিজ্ঞতার সার্থক প্রয়োগ হতে পারে এমন নিদর্শন এযাবৎ অব্দি পাইনি।

উপসংহার: চেতনা ফিরল বৌ এর ধাক্কাতে - কিগো ক্যাবলাচো হয়ে মূর্তির দিকে তাকিয়ে কেন? আশেপাশে সুন্দরী গুলোকে আড়চোখে দেখলে বুঝতাম সুস্থ-সবল-সচরিত্রে আছো। বৈরাগ্যতে ধরল নাকি? দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম না, আজ রাতে একটু লুডোই খেলব।



কিছু রাজনৈতিক কথা

- বিতান সানা

Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. But in politics, Bhakti or hero-worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship.

বি আর আম্বেদকর Constituent Assembly এর শেষ দিন অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের ২৫ শে নভেম্বর তাঁর বক্তৃতায় মধ্যে এই কথাটি বলেছিলেন। কিন্তু, প্রশ্ন হলো, কেন বলেছিলেন?

আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি। কংগ্রেসের একটা বিক্ষুব্ধ অংশ যারা মূলত রাজনীতিকে ইনকাম করার রাস্তা হিসেবে দেখতো, তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে

১৯৯৮ সালের ১লা জানুয়ারি বিজেপি আর আরএসএসের সহায়তায় তৃণমূল কংগ্রেস নামের একটা রাজনৈতিক দল গঠন করে। পরের বছরই ১৯৯৯ সালেই তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অণুপ্রেরণায় বিজেপির এনডিএর শরীক হয়েছিলো। এরপর ২০০৩ সালের আরএসএসের একটি অনুষ্ঠানে তারাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'দুর্গা' বলে অভিহিত করেন। মমতা প্রত্যুত্তরে জানান তাদের সাহায্য পেলে তিনি রাজ্য থেকে সিপিআইএমকে তাড়াতে পারবেন। অর্থাৎ, এটা স্পষ্ট যে তৃণমূল কংগ্রেস কাদের সহায়তার দল গড়েছিলো।

এবার কথা হলো এই তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নীতি-আদর্শ আসলে কী ছিলো? আদৌ ছিলো কী? আজ্ঞে না। এটি একজন কেন্দ্রিক একটি রাজনৈতিক দল, দিল্লি-পাঞ্জাবের আপ পার্টির মতো।

এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেন সেটাই শেষ কথা। দলের ক্ষেত্রেও তাই, সরকারের ক্ষেত্রেও তাই। কেন, আমরা দেখিনি শিক্ষাবিষয়ক নানান ঘোষণা তিনি করছেন? এই দলের একটাই নীতি ছিলো। সেটা সিপিআইএম বিরোধিতা। এটা কোনো কথা বলুন? একটা দলের নীতি যখন শুধু সিপিআইএম তাড়ানো তাহলে বাংলার মানুষ

কিভাবে এই দলকে বা দলের নেত্রীকে বিশ্বাস করলেন? বাংলার জনগণ একটুও জানতে চাইলেন না এই দল ক্ষমতায় আসলে কী নীতিতে রাজ্যের অর্থনীতি চালাবে? পলিসি ঠিক কী হবে? এই দলের ন্যাশনাল ইস্যুতে স্ট্যান্ড কী? দলের রাজনৈতিক স্ট্যান্ড কী? লেফ্ট না রাইট? নাকি সেন্টার? আমরা কেউ জানিনা। তারাও জানাননি আজ অব্দি কারন বাংলার মানুষের সে'সবে যায় আসে না। এই রাজ্যে বা এই দেশে মুখ দেখে ভোট হয়। সেই মুখ খুব ভালো বিরোধী নেতা বা নেত্রী হতেই পারেন।

কিন্তু, তিনি যে ভালো মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হতে নাও পারেন সেটা এই রাজ্যের বা এই দেশের মানুষ ঠিক মানতে চান না।

সবাই মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না। রাজ্যের হাল দেখেছেন নিশ্চয়ই। আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার রাজনীতির জন্মলগ্ন থেকেই বুঝে গেছিলেন যে মিথ্যে কথা বারবার বললে সেটা একসময় সত্যি মনে হয়। নিশ্চয়ই হিটলারের ডানহাত গোয়বেলসের থেকে শিখেছিলেন এটা। তিনি মানুষকে এটা বোঝাতে পেরেছিলেন যে সিপিআইএম খারাপ, তৃণমূল কংগ্রেস ভালো। এর চেয়েও বড়ো কথা তিনি বোঝাতে পেরেছিলেন তিনি একজন সৎ নেত্রী। তার স্লোগান থাকতো মা মাটি মানুষ। ভুয়ো ডক্টরেট ডিগ্রি হোক বা নামের আগে কুমারী

বসানো, মানুষ সবই দেখেছে, ভুলেও গেছে। কোনো প্রশ্ন করেনি। সিঙ্গুর বলুন বা নন্দীগ্রাম! তিনি এই দুটো জায়গায় সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সিপিআইএম আসলে কৃষকবিরোধী। কিন্তু, তিনি কৃষকদের পক্ষে। মানুষ এটা বিশ্বাস করেছিলেন। বিশ্বাস করবে নাই কেন? ২০১৬ সালে সিঙ্গুরের চাষের অযোগ্য জমি কৃষকদের হাতে পুনরায় ফেরত দিয়েছিলেন। তার সেই দক্ষতা ছিলো। পরবর্তীকালে দীপক ঘোষের বইগুলো পড়েই আমরা আসল তথ্যগুলো জানতে পেরেছি। তার মিথ্যেকথা বলা শুরু তার জন্মসাল থেকেই। যাইহোক, সেদিকে আর যাচ্ছিনা।

আপনাদের সবার মনে থাকবে, ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষকে এটাই বলেছিলেন যে তাকে দেখেই যেন ভোট দেয় বাংলার মানুষ। ২৯৪ টি আসনে তিনিই প্রার্থী। বাংলার মানুষ সেটা বিশ্বাস করেছিলেন। কারন তারা তখনও মনে করতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই সৎ এবং মানবিক একজন মুখ্যমন্ত্রী। আপনি যদি ধারাবাহিকভাবে ১৯৯৮ এর পর থেকে ২০১১ এবং তারপর

২০১১ থেকে ২০২২ এর নানান ঘটনাগুলো দেখেন, আপনি বুঝবেন যে রাজনীতিতে

একজনকে অন্ধভক্তি করলে ঠিক কী পর্যায়ে ক্ষতি হতে পারে।

যেমন ধরুন তৃণমূল কংগ্রেস বাইরে বিজেপি বিরোধিতা করলেও, লোকসভার ভেতর বিগত ১১ বছরে বিজেপির আনা বিলগুলির বিপক্ষে একটিবারও ভোট দেয়নি। হয় পক্ষে ভোট দিয়েছে বা বিরত থেকেছে। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব ভালো করেই জানেন যে বাইরে বিরোধিতা করলে আর মঞ্চে দাঁড়িয়ে 'ক্যা ক্যা ছি ছি' করলেই বাংলার জনগণ বলবে, 'দেখেছো, আমাদের নেত্রী সিএএ এর বিরোধিতা করছে'। কিন্তু, লোকসভায় যে সেই বিলের বিপক্ষে তৃণমূলের ২২জন এমপি ভোট না দিয়ে বিরত থাকলেন, সেটা খুব একটা সাধারণ মানুষ জানতে পারলেন না। এটাই ম্যাজিক। এই রাজ্যের মিডিয়া সেটাই ফলাও করে দেখাবে যেটা এই রাজ্যে হচ্ছে কিন্তু, ন্যাশনাল ইস্যুতে তাদের অবস্থান অতটা মিডিয়া দেখাবে না, প্রিন্ট মিডিয়া দেখালেও রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ খবরের কাগজ পড়েন না। পড়লেও সব খবর পড়েন না। আর এইভাবেই অন্ধভক্তি দ্বিচারিতাকেও হার মানিয়ে দেয়। তৃণমূল কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক দল তো বটেই, কিন্তু এদের কোনো রাজনৈতিক নীতি-আদর্শ নেই, এরা মূলত 'পপুলিজম' নামক একটি নীতিতে বিশ্বাসী যার অর্থ মানুষকে নানান স্কিমের মাধ্যমে শুধু বিলিয়ে যাও, কোষাগারের টাকা অবাধে

খরচ করো। এই নীতি অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, দিল্লি সরকারও অনুসরণ করে। এরা সবাই রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নীতিহীন দল। এগুলো করার কারন যাতে তারা মূল ইস্যু নিয়ে মাথা না ঘামায়। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প এরমই একটি 'পপুলিস্টিক' নীতির নিকৃষ্ট উদাহরণ। এর ফলে গ্রামবাংলার লাখ লাখ মহিলারা অন্ধভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেত্রীকে ভোট দিয়ে থাকেন, তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন। ২০২১ বিধানসভা ভোটের আগে গ্রামে গ্রামে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা রাতের বেলা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের বুঝিয়েও এসেছিলেন পুনরায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতায় না আনলে, লক্ষ্মীভান্ডারে টাকা পাবেন না তারা। অগত্যা!



২০১১ থেকে ধারাবাহিকভাবে গোটা রাজ্যে সবকিছু নীল সাদা রঙে মুড়ে দেওয়া, ঝাঁ চকচকে করে দেওয়াটাও এর

অংশ। এর ফলে মানুষ এটা দেখতে চাইবেন না যে ভেতরে কী আছে, এটা কতটা টেকসই, বা এটা আসলে কে তৈরি করেছে আর কে নতুন রং করে নিজের নামে চালাচ্ছে? বাইরের সৌন্দর্য দেখেই তারা ভাববেন এটাই উন্নয়ন। আপনিই বলুন বাড়িঘরের বাইরে রং করলে, সেটাকে পরিষ্কার রাখলে দেখতে ভালো লাগেনা? রঙিন-উজ্জ্বল কিছুতে আমাদের চোখ আটকে যায়।

যেমন ধরুন, সরকারি হাসপাতাল। সেটাকে ভালো করে রং করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলেই যথেষ্ট। সাধারণ মানুষ এটাতেই খুশি।

তারা জানতে চাইবেন না সেখানে কী কী সরঞ্জাম আছে, কতজন এমডি ডাক্তার আছেন, এমার্জেন্সিতে কতজন থাকেন, কতজন ট্রেইন্ড নার্স আছেন, বেড কতগুলো আছে, দরকারে বেড পাওয়া যাবে কিনা? অনেকটা তৃণমূলের নেতারা যেইভাবে উডবার্ন ওয়ার্ডে বেড পান। হাসপাতালে নানান অপারেশনের সুবিধে কতটা আছে, রেফার করার প্রবণতা নেই তো? ওষুধের সহজলোভ্যতা কতটা আছে, কোনো সিন্ডিকেট চলছে কিনা ইত্যাদি। কারন এগুলো খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না। কী বলেন? যেমন ধরুন, সল্টলেক স্টেডিয়াম। ১৯৮৪ সালে তৈরি করলো বামফ্রন্ট সরকার,

কিন্তু, ২০১৭ সালে অনুর্দ্ধ ১৭ পুরুষ ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য সেটাকে পুনঃসংস্কার করার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করে নিজের নামে সেখানে ফলক বসিয়ে দিয়েছেন। কেউ প্রশ্ন করেছে? দুয়ারে রেশন এরমই আরও একটি উদাহরণ। রেশন নেওয়া সাধারণ মানুষ জানতেও পারছেন না এই দুয়ারে বা বলা ভালো পাড়ার মোড়ে/ ক্লাবের সামনে রেশন দেওয়ার ফলে সরকারের অতিরিক্ত কত টাকা খরচ হচ্ছে যা আমাদের করের টাকা। তারা ভাবছেন তারা সুবিধে পাচ্ছেন, এই সরকার মমতাময়ী, মানবিক কিন্তু রেশনের দোকানে নিজেরা গেলে সরকারের কত টাকা সাশ্রয় হতো সেটা তারা জানেনও না।



এখানে বলে রাখা ভালো যে হাইকোর্ট এটাকে বেআইনি বললেও খাদ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসারদের ধমকের চোটে রেশন ডিলাররা এখনও এই বেআইনি প্রকল্পটি চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। একইভাবে সরকারের করের টাকায় প্রায় প্রতিদিন সমস্ত প্রিন্ট মিডিয়ায় মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে সরকারি বিজ্ঞাপন করাটাও এর অংশ। কেউ প্রশ্ন করেননা যে কেন এত ফালতু টাকা খরচ করা হচ্ছে? রাস্তার গর্তগুলো অন্ততঃ এই টাকায় ভরাট করা যেত। কিছুদিন আগে তৃণমূলেরই এক নেতার ছেলে দুর্ঘটনায় মারা গেলন। কিন্তু, ওই যে সাধারণ মানুষ মনে করেন দুর্ঘটনা তো ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই সরকারের এক্ষেত্রে কোনো দায় নেই। রাজনীতিতে একজনের প্রতি অন্ধভক্তি আসলে সত্যিই সবকিছু ভুলিয়ে রাখে। প্রশ্ন করতেই শেখায় না। আপনি সেই দলে নেই তো?

তথ্যসূত্র:

Anandabazar Patrika

The Print

The Hindu

The Tribune

সে কিছুই জানে না; এবং সে ভাবে যে- সে সব জানেন। এটি একটি রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় ।

— জর্জ বার্নার্ড শো

মুক্তচিন্তক লেখক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে নিয়ে তাঁর ছাত্রের স্মৃতিকথা

পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না

- কৃ ষ্ণ প দ ভৌ মি ক



প্রচণ্ড দারিদ্রতাকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম প্রজন্মের ছাত্র হিসেবে কলকাতায় পড়তে গিয়ে প্রচণ্ড সমস্যার মুখোমুখি হই। ইংরেজি অনার্স পড়বার আগে ভেবে রোমাঞ্চিত হতাম যে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের খুঁটিনাটি কতো কিছু জানতে পারব। ইংরেজিটা একেবারে মাতৃভাষার মতো হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখলাম, ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি যাবতীয় আকর্ষণ শেষ করে দেওয়ার পক্ষে ইংরেজি অনার্স কোর্সটিই যথেষ্ট। ইংরেজির তেমন কিছু জানতে হবে না,শুধু নোটস কিনে মুখস্ত করতে হবে। সেই নোটসের মধ্যে নানা জনের লেখা থেকে টুকে বড় বড় কোটেশন দিয়ে নানা রকমের বিশেষণ ব্যাবহার করে বোঝানো আছে লেখক কিংবা কবি কতো ভালো লিখেছেন, কিংবা টাইটেল টা খুব সুন্দর হয়েছে ইত্যাদি! একই কথার চর্বিতচর্বণ করে, একটু

এদিক ওদিক করে বিচ্ছিরি হাতের লেখায় সব বড় বড় এক গাদা নোটস। আমার নিজের থাকা খাওয়ার জন্য টাকা নাই। তার ওপর নোটস জোগাড় করতে অনেক টাকা দিয়ে টিউশন পড়তে হবে। অসম্ভব ব্যাপার। আমি বরাবরের অন্তর্মুখী। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারতাম না। তাই ক্লাসে যে স্যারের পড়া খুব ভালো লাগে, সেই স্যারকেই সমস্যার কথা জানিয়ে কলেজের ঠিকানায় একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলাম। কিছু দিন পরে দেখি আমার গ্রামের বাড়িতে একটা চিঠি আসে। আমাদের প্রিয় অধ্যাপক শ্রী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের লেখা চিঠি। চিঠিতে তিনি আমাকে পূজার ছুটির পর কলেজ খুললে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। চিঠি পেয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল সেদিন।

দেখা করে বললাম, স্যার গ্রামে থাকার সময় নিজে নিজে পড়াশুনা করেছি, এইভাবে টিউশন পড়তাম না। বইপত্র সব বাঙলায় হওয়ায় কোনও সমস্যা হয় নি এতোদিন। কিন্তু এখন খুব সমস্যা হচ্ছে। সবচেয়ে সমস্যা হলো আমার মুখস্ত মনে থাকে না। আর না বুঝে মুখস্ত করতেও পারি না। আমাদের প্রিয় RKB Sir বললেন Self-Study হলো শিক্ষার সবচেয়ে ভালো উপায়। তিনি আমার হতাশ মনে সাহস দিয়ে বললেন টেক্সট গুলো আগে ভালো করে পড়। তারপর নিজে থেকে এক একটা প্রশ্নের উত্তর লিখে ফেল। তারপর যা লিখবি আমাকে দিয়ে চেক করিয়ে নিবি। বাড়ির ঠিকানাটাও দিলেন। সেই শুরু। যখন বললাম স্যার কোটেশন কি দিতেই হবে? কোটেশন হুবহু মনে থাকে না যে। তিনি বললেন কোথায় কে কী বলেছেন সেটা মুখস্ত করতে পারলি কিনা পরীক্ষায় তা জানতে চাওয়া হয় না। ইউনিভার্সিটি জানতে চায় তুই নিজে কী বুঝেছিস। আমার সুবিধার জন্য তিনি অনেক বইও দিতেন।

এরপর নিয়মিত যাতায়াত, বইপত্র, সমাজ ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করতাম। পরবর্তীতে, আমার এম. এ. পড়ার সময়ও যাবতীয় জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজতে আমি এই স্যারের কাছেই যেতাম।

আমি বুঝতে পারি RKB এমন একজন প্রকৃত শিক্ষক যাঁর কাছে সিলেবাস নির্ভর পড়াশুনার বাইরে,জ্ঞান সমুদ্রের অগাধ মণিমুক্তোর সন্ধান আছে, যেগুলি আমার খুব প্রয়োজন।

তিনি বস্তুবাদী দার্শনিক, চার্বাকের ওপর তাঁর অনেক গবেষণা। তিনি যুক্তিবাদী ও নাস্তিক মানুষ।

এই জায়গায় আমার চিন্তা ভাবনার সঙ্গে বিরাট মিল খুঁজে পাই।



শুধু ঝুঁকি নেওয়ার হিম্মত নয়, অপমান সইবার সাহস। নিজের জ্ঞানবুদ্ধিতে যা ঠিক বলে জেনেছি, তাকে ধরে রাখার সাহস। ভুল করলে কবুল করার সাহস কোনও চাপের মুখেই মূল নীতিকে বিসর্জন না দেওয়ার সাহস।

পর্ব - ২

অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই জ্ঞানের উপাসক। তিনি সংসার করেননি, শ্যামবাজারের মোহনলাল স্ট্রিটের পুরনো লাল বাড়িটির টপ ফ্লোরটিতে ছিল তাঁর অন্য রকমের এক সংসার। দুটো ঘর ভর্তি নানা রকমের বই আর বই, সঙ্গে তাঁর নিজস্ব গবেষণালব্ধ বিভিন্ন বই ও লেখা পত্র এবং একটা কম্পিউটার। যখনই যেতাম দেখতাম কোনও না কোনও প্রকাশক, গবেষক, বিখ্যাত ম্যাগাজিন এবং লিট্ল ম্যাগাজিনের জন্য লেখা প্রত্যাশী লোকজন এসেছেন কথা বলতে। অত্যন্ত সময়ানুবর্তী মানুষটির খাওয়া, লাইব্রেরিতে যাওয়া, পড়াশুনা, লেখালেখি সবই নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী হতো। প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন।



তাঁর গবেষণালব্ধ বইগুলো পড়লে বোঝা যায়, যে অন্য কোনও গবেষকের তথ্যকে যাচাই না করে তিনি গ্রহণ করতেন না বা কোনও সিদ্ধান্তে আসতেন না। বিদ্যাসাগরের ওপর তাঁর "বিদ্যাসাগর: নানা প্রসঙ্গ" বইটি অতুলনীয়, যেখানে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে তোলা বিভিন্ন প্রশ্নের তথ্য প্রমাণ সহ আলোচনা আছে। এছাড়াও তিনি Aristotle এর Poetics, এবং Sophocles এর King Oedipus র ওপরও গবেষণা করেছেন। তিনি তাঁর লেখা গুলি প্রকাশ করেছেন এক অতি সুন্দর, সহজবোধ্য নিজস্ব গদ্য রীতিতে।

রামকৃষ্ণ বাবু ছিলেন দলীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত মার্ক্সবাদ চর্চার একজন কাণ্ডারী।

ইউরোপীয় রেনেসাঁর ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শনের যে বিকাশ লাভ হয়েছিল, তারই গর্ভে জন্ম নিয়েছিল

মার্ক্সবাদ। এখন মার্ক্সবাদের আলোকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়তে হলে দরকার মানুষের মধ্যে চেতনার গুণগত মানোন্নয়ন, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি থেকে মুক্তি, জ্ঞান বিজ্ঞান তথা বস্তুবাদী দর্শনের প্রসার। অধ্যাপক ভট্টাচার্য ঠিক এই জায়গাটাতে হাত দিয়েছিলেন। বিখ্যাত সব ম্যাগাজিনের পাশাপাশি অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন, পাক্ষীক, ছোট ছোট বই, বিভিন্ন গণসংগঠন, সমাজ সচেতন সহকর্মী, দেশে বিদেশে ছড়িয়ে থাকা অধ্যাপক, শিক্ষক, পাঠক, সমাজকর্মী, মানবাধিকার আন্দোলনের সংগঠক ও ছাত্র ছাত্রীরা মিলে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল জনপরিসর, যার মধ্যমণি আমাদের

RKB যাঁর লক্ষ্য ছিল এদের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জনমানসে বিজ্ঞান ভিত্তিক ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার।

এজন্য তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে কর্পোরেট মিডিয়ার আকর্ষণীয় প্রস্তাব ও আত্মপ্রচারকে দুরে ঠেলে দিয়েছেন। কিছুদিন আগে আমি একবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, স্যার, আমরা আপনাকে নিয়ে একটা লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা প্রকাশ করতে চাই। এ জন্য একাধিক সম্পাদক মুখিয়ে আছেন। তিনি বললেন কখ্খনো না, আমি বেঁচে থাকতে তো হবেই না, আমি মারা যাওয়ার পরও যেন না হয়। তিনি চান ব্যাক্তির প্রচার নয়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রচার হোক। বর্তমানে আত্মপ্রচার সর্বস্ব বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীরা যেখানে একদিকে জনগণের জন্য 'দুঃখে' কুম্ভীরাশ্রু ফেলছে, আর অন্যদিকে ক্ষমতার পিঠ চাপড়ে নিজেরটা গুছিয়ে নেওয়ার জন্য হামলে পড়ছে অর্থাৎ ঠকবাজীতে অকুতোভয়, সেখানে নীরবে নিভৃতে থাকা RKB র মতো মানুষ আমাদের কাছে যেন বটবৃক্ষের নীচে এক শান্ত ছায়াতল।।

পর্ব-৩

স্যারের রসবোধটিও ছিল অসাধারণ। একবার স্যারের টেবিলে গিয়ে ভগবান ভীত সংবাদপত্রটি দেখে বলি স্যার নাস্তিক মানুষের কাছে এই কাগজ কেন? স্যার হেসে বলেন, এই কাগজটা দেখে তুই আমাকে ছোটলোক ভেবে বসলি! একবার বাংলাদেশের এক গবেষক কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এসেছিলেন। RKB র সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে আসেন। কিছুক্ষণ পর তার কথাবার্তা মুজিবর রহমানের দিকে ঘুরে যায়। তিনি নানাভাবে বোঝাতে থাকেন মুজিবর রহমান এক সাংঘাতিক খারাপ লোক, আর তার দলটিও ততোধিক খারাপ। এই বোঝানোর প্রক্রিয়ায় মূল প্রসঙ্গ ছেড়ে অনেকটা সময় নষ্ট করেন। তিনি চলে গেলে স্যার আমাদের বলেন মুজিব তো আরও একবার নিহত হলেনই, সঙ্গে আমার আজকের বিকেলটাও মারা পড়ল।



প্রতিটি ছাত্রকে তিনি এক অদ্ভুত অনুপ্রেরণা দিতে পারতেন। মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে বলতাম স্যার প্রগতিশীলতার পক্ষে সমাজের কোনও পরিবর্তন তো দেখতে পাচ্ছি না। এতো শিক্ষক, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ইত্যাদি যাইহোক না কেন, তাদের বেশিরভাগই তো সাংঘাতিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মান্ধ, গতানুগতিক এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। তিনি বলতেন সভ্যতার ইতিহাস হাজার হাজার বছরের চলমান প্রক্রিয়া। আর একটা মানুষের জীবন ষাট সত্তর বছরের জীবন। এই এত অল্প সময়ে সবকিছু ভালো দেখে যেতে পারব ভাবলে

চলে না। একটু একটু করে পরিবর্তন অবশ্যই হয়। আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে এই প্রগতিশীলতার ধারাটিকে যতটা পারি রক্ষা ও বেগবান করার চেষ্টা করে যেতে হবে। তিনি ক্লান্তিহীন উৎসাহদাতা।

নাস্তিকরাই ধর্মটাকে ভালো বোঝে, রবিঠাকুরের এই কথাটা RKB Sir এর কাছে এলে বেশ মালুম হয়। ধর্ম তত্ত্ব নিয়ে তাঁর ব্যপক পড়াশুনা ও গবেষণা।

তাই ঈশ্বর বা ঠাকুর দেবতা নিয়ে বিন্দুমাত্র মোহ নাই তাঁর। তিনি বস্তুবাদের পক্ষে যেখানে যা উপাদান পেয়েছেন, তাই সংগ্রহ করেছেন। "উপনিষদে বস্তুবাদ" তাঁর একটি অনবদ্য প্রবন্ধ। তাঁর জীবনই আমাদের কাছে একটা শিক্ষণীয় বিষয়। তাঁর কাছে গেলে তিনি কখনও তাঁর একটা বই কিনতে বলেন নি। ফুলের প্রতি সবাই যেমন আকৃষ্ট হয়, আমরাও আকৃষ্ট হয়ে যেতাম তাঁর কাছে।

যখনই যেতাম তিনি আমার বাড়ির খবর, আত্মীয় স্বজনদের খবর, গ্রামের খবর, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের খবরাখবর নিতেন। কিছুদিন আগে বাড়িতে গিয়ে ছিলাম, গত ২৬শে সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগরের জন্ম দিনে শেষবারের মতো হাসপাতালে গিয়ে Sir কে দেখলাম, তিনি কিছু বললেন, কিন্তু কী বললেন কিছু বুঝতে পারলাম না। আর কোনো দিন তিনি কথা বলবেন না, কিন্তু তাঁর শিক্ষা, তাঁর বইপত্র চিরকাল আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। তিনি সর্বত্যাগী, মানবতাবাদী। গত ২ রা অক্টোবর, ২০২২ রবিবার তিনি প্রয়াত হলে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার দেহ এন আর এস হাসপাতালে দান করা হয়। তারপর, তারপর কোনও শ্রাদ্ধ নয়, শান্তি নয়, নয় কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান।



জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য: মেঘনাদ সাহা

- জয়ন্ত ঘোষ

১৮৯৩ সালের ৬ই অক্টোবর মেঘনাদ সাহার জন্ম হয় ঢাকার অদূরে শ্যাওড়াতলী নামক গ্রামে। পিতা জগন্নাথ সাহার দুই ছেলে ও দুই মেয়ের পর মেঘনাদ সাহা ছিলেন পঞ্চম সন্তান। মেঘনাদ সাহার জন্মের রাত ছিল ঝড় আর দুর্যোগের। তখনকার সময়ে আঁতুড় ঘরটি থাকতো মূল বাড়ী

থেকে একটু দূরে। সেদিন বৃষ্টি আর বিদ্যুতের ঘনঘটার মধ্যে দমকা হাওয়ায় আঁতুড় ঘরের চাল উড়ে গেল। ঝড়-বৃষ্টির বিরাম নেই দেখে বৃষ্টির দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য শিশুর ঠাকুমা তার নাম রাখলেন মেঘনাথ। পরে এটি হয়ে যায় মেঘনাদ। (শান্তিময় ও এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, ১৯৫৯)

বিজ্ঞানসাধক মেঘনাদ সাহার ব্যক্তিবিশেষের ঊর্দ্ধে গিয়ে নিজেই একজন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বিরাজমান। আজ তাঁর জন্মদিনে এখানে আমি মেঘনাদ সাহার প্রতিষ্ঠান স্থাপনা, রাজনৈতিক জীবন এবং অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন নিয়ে তার মতাদর্শ আলোচনা করবো।

(১) কলকাতায় ফেরা ও এক নতুন প্রতিষ্ঠানের শুভারম্ভ:

এলাহাবাদ ছেড়ে ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে ডঃ মেঘনাদ সাহা ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ক্যালকাটাতে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের পালিত অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। তখন সাহার কাছে দুটি প্রস্তাব এসেছিল – একটি কলকাতার পালিত অধ্যাপকপদ, অন্যটি বথের রয়াল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এর অধ্যক্ষ পদ। তিনি বেছে নিলেন প্রথমটি। কলকাতা ফিরেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের সিলেবাসে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পড়ানোর প্রস্তাব দেন এবং নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে একটি বিশেষ পেপার চালু করেন। পাশাপাশি কলকাতায় একটি

নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর প্রতিষ্ঠান বানানোর পরিকল্পনা শুরু করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি দেশের আরো অনেক প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সাথে ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা-র বিভিন্ন গবেষণাগার ভ্রমণ করেন তিনি। ১৯৪৫ সালে তিনি যান রাশিয়াতে রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের একটি অনুষ্ঠানে। এর আগে ১৯৩৬ সালের জুন মাসে তিনি যান ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ যোগ দিতে।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন পাউলি, হাইজেনবার্গ, ম্যাক্স বর্ন, ওপেনহাইমার, নীলস বোর, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানী।

ভেবে দেখুন তখনকার দিনে এমন একটি প্রতিষ্ঠান বানানো খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। প্রয়োজন ফান্ডিং। তখন ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ এর মধ্যে তিনি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মিটিং-এর সূত্রে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কাছে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। সেই সময় ডঃ সাহা নেহেরুকে নিউক্লিয়ার শক্তির গুরুত্ব ও এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা দিতে থাকেন। প্রাথমিক সফলতা পেলেন ডঃ মেঘনাদ সাহা। জওহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে তিনি ১৯৪১ সালে স্যার ডোরাব টাটা ট্রাস্ট থেকে ৬০ হাজার টাকা, ১৯৪২ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬০ হাজার টাকা, ১৯৪৩ সালে জি. ডি. বিড়লার কাছ থেকে পাঁচ বছরের জন্য

১২ হাজার টাকা করে গবেষণার জন্য ফান্ড সংগ্রহ করেন। ডঃ সাহা তাঁর ছাত্র বি. ডি. নাগচৌধুরীকে ১৯৩৮ সালে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ক্যালিফোর্নিয়াতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। তিন বছর পর নাগচৌধুরী দেশে ফিরলে তাঁকে যোগ্য সহকারী হিসেবে পাশে নিয়ে দেশের প্রথম সাইক্লোট্রন বানানোর কাজে ব্রতী হন ডঃ সাহা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তাঁর কাজের জন্য বিদেশ থেকে অনেক যন্ত্রাংশ পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো।

এরপর ১৯৪৭ সালে তিনি তাঁর নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রায় ৬ লাখ ২০ হাজার টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। এর মধ্যে জওহরলাল নেহেরু মাধ্যমে অনুদান হিসেবে পান ৭০,০০০ টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান ছিল ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান ২ লাখ টাকা। শেষমেশ ১৯৪৮ সালের ২১শে এপ্রিল তিনি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের। ১৯৫০ সালের ১১ই জানুয়ারী ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বিল্ডিংয়ের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী আইরিন জোলিয়েট ক্যুরি (মাদাম ক্যুরি-র কন্যা)। (Pramod V. Naik, 2017)

(২) ডঃ মেঘনাদ সাহা ও অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন:

১৯৪৮ সালের ১৫ই এপ্রিল নবগঠিত ভারত সরকার “The Atomic Energy Act XXIX” লাগু করেন। সে বছরেরই

৯ই অগাস্ট গঠিত হয় “The Atomic Energy Commission”, যার চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন, ডঃ কে. এস. কৃষ্ণণ, ডঃ শান্তিস্বরূপ। অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্টে বলা হল: এই কমিশন সম্পূর্ণ গোপনীয়তার সাথে কাজ করবে এবং কমিশনের চেয়ারম্যান “answerable directly to the Prime Minister.”

সম্ভবত এই সময়ে অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাক্টের তীব্র সমালোচনা করেন ডঃ সাহা। পরবর্তীকালে একটি পত্রে তিনি জওহরলাল নেহেরুকে লেখেন: “I have been put to one humiliation after another. I have been asked to take orders from Bhatnagar, whom I consider a very poor scientist, and from Bhabha, who though a good scientist, but [he] is 18 years my junior and the conferment of enormous power on him has made him extremely bumptious. They would have throttled my scientific activities completely, but probably in your calmer moments, you think that I am not so bad as they represent me to you. So I have been given doles from time to time in order that my scientific efforts

may not be completely throttled.” (Abha Sur, 2002)

জওহরলাল নেহেরু সাহার এই সমালোচনাকে “not only unjustified but completely lacking in objectivity and therefore most unscientific” বলে উড়িয়ে দেন। এর সঙ্গে জওহরলাল নেহেরু কটূক্তির সুরে বলেন: “If you attack the Government, surely you do not expect them to remain silent.” (Abha Sur, 2002)

ডঃ সাহা ও ডঃ ভাবার মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও, গবেষণাক্ষেত্রে একে অন্যকে সাহায্যই করেছেন। ১৯৫৪ সালে ডঃ ভাবা অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের বাজেট থেকে ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গবেষণাখাতে ৫০ লাখ টাকা দেবার প্রস্তাব রাখেন ডঃ সাহার কাছে। ডঃ সাহা সেই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। (Pramod V. Naik, 2017)

(৩) রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে ডঃ মেঘনাদ সাহা:

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের সাথে ডঃ মেঘনাদ সাহার সুসম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রে নেতাজীর দাদা শরৎচন্দ্র বোসের পরিচয় হয় ডঃ মেঘনাদ সাহার সাথে। শরৎচন্দ্র বোস ১৯৪৬ সালে প্রথম অন্তর্বর্তী ভারত সরকারের একজন সদস্য ছিলেন। তিনিই ডঃ মেঘনাদ সাহাকে পার্লামেন্টে

যোগ দেবার জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন। ডঃ মেঘনাদ সাহা ন্যাশনাল প্ল্যানিং, রিভার ভ্যালি ডেভলেপমেন্ট, শিল্পের আধুনিকীকরণ, শিক্ষার আধুনিকীকরণ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে অনেক ধারণা দিয়েছিলেন, তাই দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে তাঁর পার্লামেন্টে যোগ দেওয়াটা আবশ্যিক বলে মনে করতেন শরৎচন্দ্র বোস। (Pramod V. Naik, 2017)

১৯৫২ সাল। দেশের প্রথম সাধারণ লোকসভা নির্বাচন। শরৎচন্দ্র বোস ততোদিনে পরলোকগমন করেছেন। শরৎচন্দ্র বোসের পত্নী বিভাবতী বোসের পরামর্শে উত্তর-পশ্চিম কোলকাতা থেকে বাম সমর্থিত নির্দলীয় প্রার্থী হলেন ডঃ সাহা।

যদিও ডঃ সাহা কমিউনিস্ট ভাবধারায় বিশ্বাস করতেন কিন্তু কখনো কোনো বামপন্থী সংগঠনের সদস্য হননি। বিপুল ভোটে জয়ী হন তিনি।

১৯৫২ থেকে আমৃত্যু ১৯৫৬ পর্যন্ত লোকসভার সদস্য ছিলেন তিনি।

লোকসভায় বেশ সক্রিয় এবং জনপ্রিয় বক্তা ছিলেন ডঃ মেঘনাদ সাহা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নদীপ্লাবণ ও বাঁধ পরিকল্পনা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, নিউক্লিয়ার শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে লোকসভায় আলোচনা করেছেন তিনি।

নিউক্লিয়ার শক্তি সংক্রান্ত প্রথম আলোচনা তিনি লোকসভায় করেন ১৯৫৪ সালের ১০ই মে। আলোচনার বিষয় “Peaceful uses of Atomic Energy.”। এই সংক্রান্ত পরবর্তী বিতর্কসভায় তিনি অংশগ্রহণ করেন ১৯৫৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী।

১০ই মে-র বক্তব্যে ডঃ সাহা বলেন: “Any scientist, however great he might be, cannot do this work alone. In scientific work, sometimes we find that it is not an Einstein or a Newton who can solve any problem.

Sometimes the problem was solved by a man who may be a back-bencher. Scientific work was the result of co-operation of a large number of brains.

Sometimes, a suggestion or a method of work comes from persons who were considered not very prominent or very able. In the development of atomic energy work in America, we find, suggestions have been made by persons whose names we do not know, we

have not known till the other day. The most prominent scientists who were there had made absolutely no contribution. I want our government to take all these matters into consideration and lay down a sound policy for the development of atomic energy in this country." (Pramod V. Naik, 2017)

এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেন: "...An eminent Member of the other side, who used to be a great scientist, Prof. Meghnad Saha, but who drifted from the fields of science and has found no foothold elsewhere yet, told us many things, most of which I think are completely wrong. I have seldom come across a less scientific approach to a problem than that of Prof. Meghnad Saha, in fact, a less factual approach. I can only express my deep regret that such an eminent scientist should have fallen into such evil ways of thinking..." (Pramod V. Naik, 2017)

প্রত্যুত্তরে ডঃ সাহা কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ না করেই বিদ্রূপের ঢঙে বলেন: '...I may add that I have done

very little in science, but my name would be remembered for some hundreds of years while some politicians here will go to unregretted oblivion in a few years'. (Pramod V. Naik, 2017)

অর্থাৎ, ডঃ মেঘনাদ সাহা অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন বা ডঃ ভাবার বিরোধী ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন অ্যাটমিক এনার্জি গবেষণার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো, আরো উন্নত ও মেধাবী গবেষক, মানবকল্যাণে এর ব্যবহার। তিনি সমালোচক ছিলেন চটজলদি সরকারী নীতি প্রণয়নের। তার মৃত্যু নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না, কারন মেঘনাদ সাহার মতো ব্যক্তিত্ত্বের মৃত্যু হয়না, তারা চির অমলিন থাকেন আমাদের হৃদয়ে। আসলে মেঘনাদ সাহা এক আন্দোলনের নাম, মেঘনাদ সাহা এক আধুনিক মতাদর্শ তথা ভাবধারার নাম, মেঘনাদ সাহা এক স্বতন্ত্র ভারতীয় বিজ্ঞানচেতনার প্রতীক।

© জয়ন্ত ঘোষ, ভূ-পদার্থবিদ্, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া।

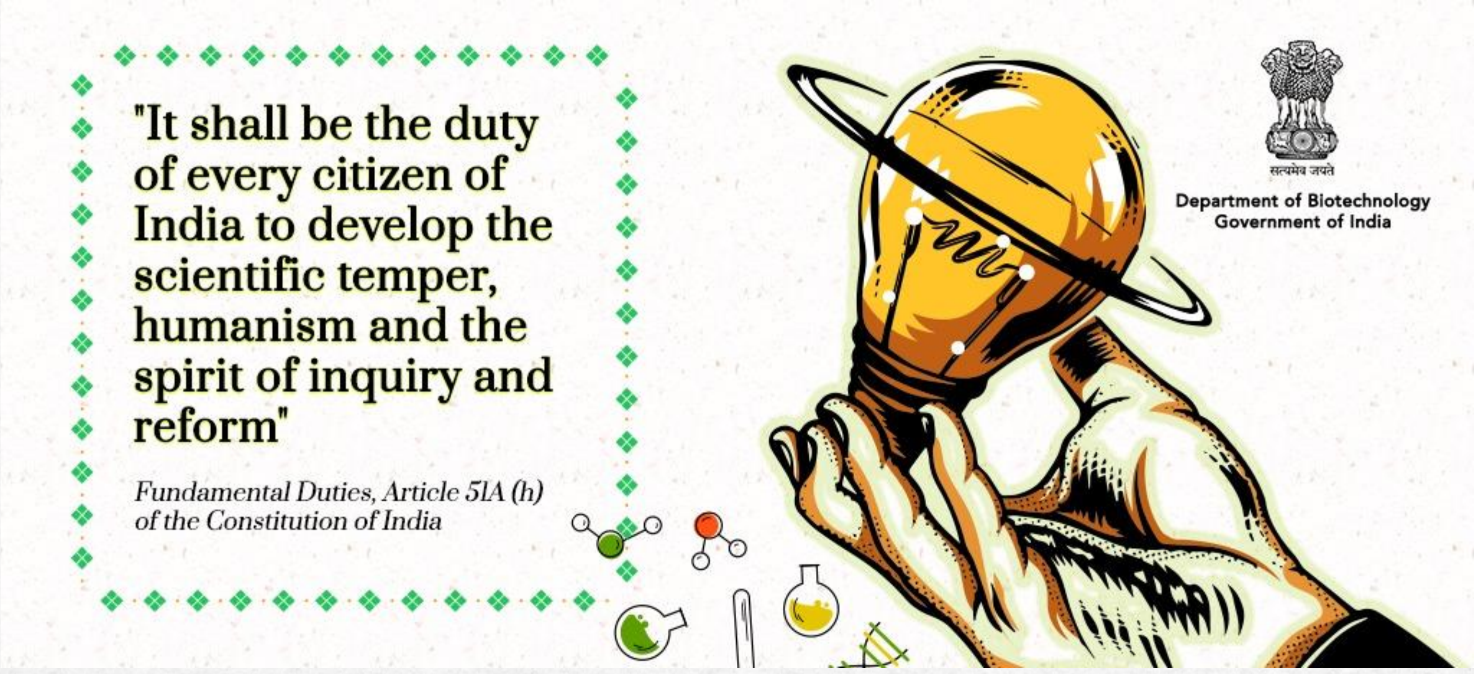
তথ্যসূত্র:

(১) মেঘনাদ সাহা, শান্তিময় ও এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৫৯।

(২) Meghnad Saha: His Life in Science and Politics, Pramod V. Naik, Springer, 2017.

(৩) Scientism and social justice: Meghnad Saha's critique of the state of science in India, Abha Sur, Historical Studies in the Physical and Biological Sciences, Vol. 33, No. 1 (2002), pp. 87-105.

(৪) Meghnad Saha: His Science and Persona through Selected Letters and Writings, Jibamitra Ganguly with Reminiscences of a Daughter Chitra Roy, Indian National Science Academy, 2019.



বিজ্ঞানমনস্কতা বনাম শিল্পস্বাধীনতা!

- লো ক না থ

১৯৭৬ সালে ৪২তম সংশোধনী আইনে ভারতীয় সংবিধানে যুক্ত হয় ১০টি নাগরিক মৌলিক কর্তব্য (পার্ট IV-A, আর্টিকল 51A) এবং পরবর্তীকালে আরো ১টি। এই মৌলিক কর্তব্য পালন আবশ্যক নয়, এই কর্তব্য পালনে নাগরিককে বাধ্য করার আইনি ক্ষমতার সংস্থান ভারতীয় সংবিধানে নেই। মৌলিক কর্তব্যগুলি মূলত নাগরিকের নৈতিক শিক্ষা এবং মননের গঠনের উদ্দেশ্যে সংযোজিত হয়েছে। এই মৌলিক কর্তব্যগুলির মধ্যে অষ্টম কর্তব্যটি হল "Develope Scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform". ভারতবর্ষের মত ধর্মপ্রবল দেশে বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরির লড়াই অত্যন্ত কঠিন। আর এই কঠিন লড়াই লড়ে চলেছেন বিভিন্ন মঞ্চ, সংস্থার সাথে যুক্ত বিজ্ঞানকর্মী এবং সমাজকর্মীরা। বছরের পর

বছর ধরে তারা নিজেদের জীবন নিয়োজিত করেছেন সমাজে বিজ্ঞানচেতনা তৈরির কাজে। আর ঠিক এর বিপরীত চলেছে অপবিজ্ঞান, অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের চাষ। রাজনৈতিক, সামাজিক আধিপত্য অটুট রাখার জন্য কিছু ধান্দাবাজ, ক্ষমতালোভী মানুষ নিরন্তর চালিয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানবিমুখ প্রগতিশীলতা বিরোধী আন্দোলন। খুব স্পষ্ট উদাহরণ হিসাবে দেশের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিগুলোর দিকে তাকানো যায়। কুসংস্কার, অপবিজ্ঞান, অন্ধবিশ্বাসের প্রচারে নির্মিত হয়ে চলেছে একের পর এক সিনেমা। এই প্রবণতা আরো বেড়েছে যখন আধুনিক VFX প্রযুক্তির ব্যবহার সহজ করে দিয়েছে এই ধরনের সিনেমাগুলোর দৃশ্যায়ন। ক্ষমতাসীন শক্তিগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় আরো বেশি এই ধরনের সিনেমা তৈরির উদ্যোগ বেড়েছে। দুঃখের বিষয় এই সূক্ষ্ম রাজনৈতিক আগ্রহকে আমরা এখনও সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করিনি।

পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞানকর্মীদের বহুবছরের আন্দোলনে কার্যত জল ঢেলে দিয়েছিল ১৯৭৭ সালে নির্মিত “বাবা তারকনাথ” সিনেমাটি।

সাপের কামড়ে মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে সাপ বিষ ফেরত নিচ্ছে(!), তাও আবার দৈবিক নির্দেশে! অপবিজ্ঞান, কুশিক্ষা, বিজ্ঞানবিমুখতার সর্বোচ্চস্তর এই সিনেমাটি। এই চূড়ান্ত মিথ্যে, ভ্রান্ত অপপ্রচার গ্রামবাংলার কত মানুষকে প্রভাবিত

করেছে এবং কত মানুষের অকালমৃত্যুর কারন হয়েছে তার হিসেব কেউ জানে না।

এখনও আমরা সংবাদপত্রের পাতায় খবর দেখি যে, ওঝা বা গুনিনের কাছে নিয়ে যাওয়ার কারণে সাপের কামড়ে বিষ ছড়িয়ে মৃত্যু।

সাপের কামড়ের ১০০ মিনিট (প্রায় দেড়ঘণ্টা) সময়ের মধ্যে অ্যান্টিভেনম ইনজেকশন দিতে পারলে নিশ্চিতভাবে মৃত্যু আটকানো যায়,

বিজ্ঞানের এই সাফল্যের উপকার থেকে লাভবান হতে পারেন না বহু অভাগা মানুষ ও পরিবার। কারন শিক্ষার অভাব এবং অপশিক্ষার প্রচার। সম্পূর্ন অবৈজ্ঞানিক প্রাণঘাতী এই ফালতু সিনেমাটি পরবর্তীকালে একাধিকবার প্রেক্ষাগৃহগুলোতে মুক্তি পায় বাণিজ্যিক স্বার্থে এবং বহু মানুষের কাছে পৌঁছে তাদেরকে প্রভাবিত করে। সাধারণত দক্ষিণপন্থী মৌলবাদী শক্তিগুলি এই ধরনের পশ্চাদপসারী অপশিক্ষা প্রচারে পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের সিনেমা তৈরি এবং রিলিজ হওয়া আটকানো যায়নি।

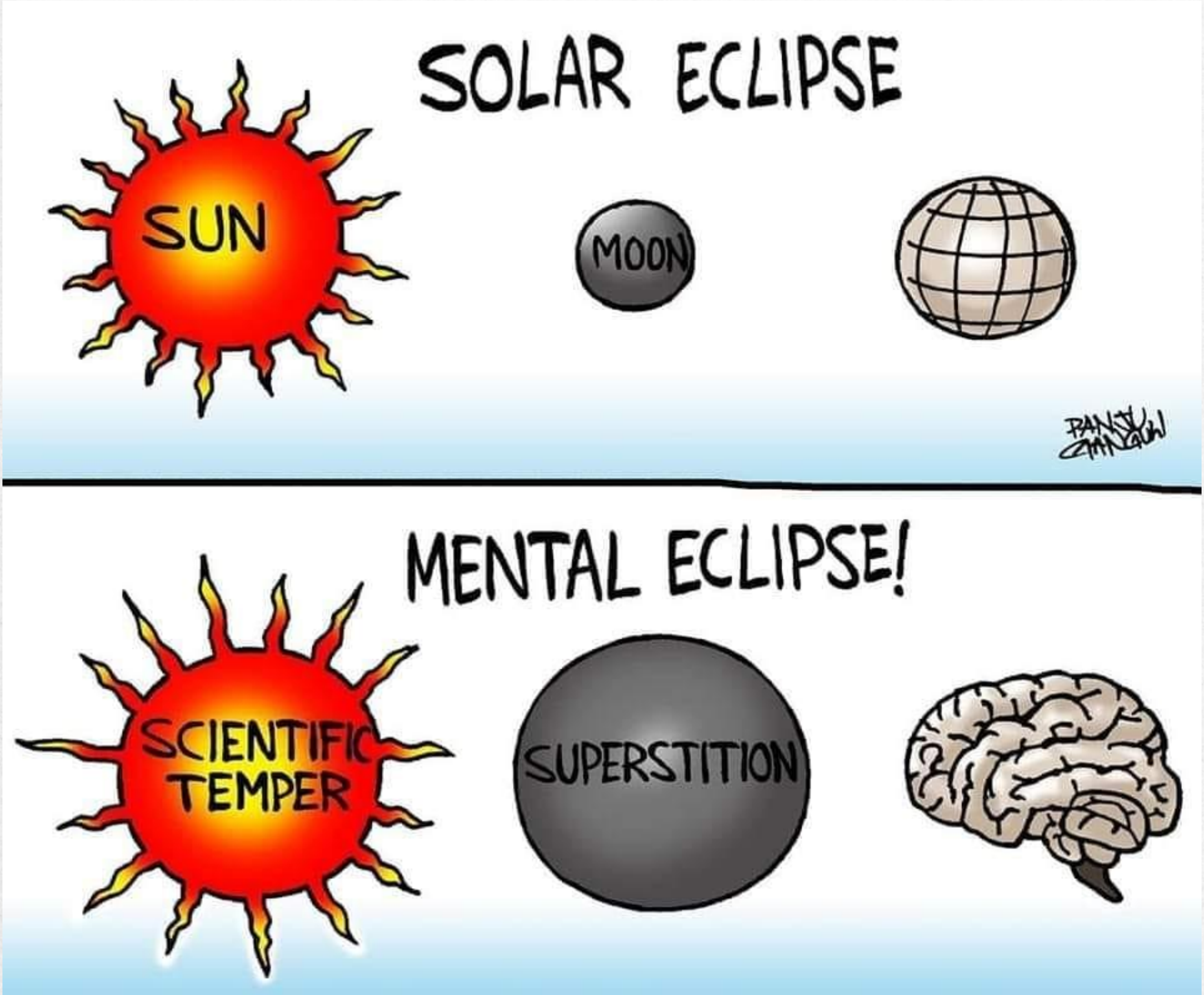
এই ধরনের অপবিজ্ঞান ও কুসংস্কারমূলক সিনেমার বিরুদ্ধে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যে তীব্র সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন ছিল, তা গড়ে ওঠেনি। প্রশাসনিকভাবে আটকানো সম্ভব না হওয়ার কারন সম্ভবত সংবিধানের আর্টিকেল ১৯ এবং ২৫। এই দুটি মৌলিক অধিকারের মধ্যে প্রথমটি বাকস্বাধীনতা এবং দ্বিতীয়টি যেকোনো ধর্মমত প্রচার, প্রসারের স্বাধীনতা। শিল্প এবং শিল্পীর স্বাধীনতার নামে সমাজকে পিছনে ঠেলে দেওয়ার এই ঘৃণ্য প্রক্রিয়াকে আটকানোর জন্য কোনো আইনের সংস্থান ভারতীয় সংবিধানে নেই। তাই স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়ে এসেও বিজ্ঞানমনস্ক প্রগতিশীল সমাজগঠনের জন্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিজ্ঞানসচেতন মানুষের কাছে একমাত্র হাতিয়ার প্রচার আন্দোলন।

যতদিন পর্যন্ত এই ধরনের অপবিজ্ঞান কুশিক্ষার প্রচার রোধে সুসংবদ্ধ আইন তৈরি না হচ্ছে, দেশের বিজ্ঞানকর্মী এবং সমাজকর্মীদের কাছে এই লড়াই খুবই কঠিন এবং দীর্ঘ।

বাণিজ্যিক বা রাজনৈতিক স্বার্থে অপবিজ্ঞান প্রচারকে আটকানো না গেলে গণেশের দুধ খাওয়া, গণেশের প্লাস্টিক সার্জারি কিংবা গণেশের ছবি টাকায় দিয়ে অর্থনীতি উদ্ধারের

মত অপবিজ্ঞানবোধ আমাদের আরো কয়েকশত বছর পিছিয়ে দেবে।

লোকনাথ, Durgapur



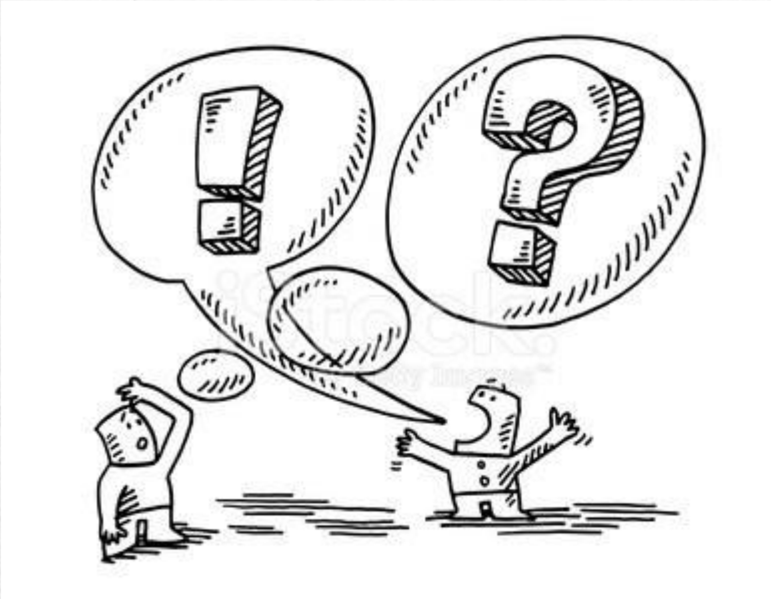


কুযুক্তি বহুল প্রচলিত কুযুক্তি বা হেত্বাভাস

ভূমিকা:

গণিত বিষয়ক জ্ঞান যেমন প্রত্যেকের থাকা উচিত, তেমনি যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানও প্রত্যেকের থাকা উচিত। ৫ + ২ = ৭ এটি সব সুস্থ মানুষই মেনে নেয়। সম্পূর্ণ বা আংশিক অসুস্থ অথবা ভন্ড মানুষ যারা তারা হয়ত মানে না যে, ৫ + ২ = ৭ হয়। অথবা তারা অপ্রয়োজনীয় এমন কথাবার্তা (ত্যানাবাজী) করে যে, বোঝা যায় না – তারা কি এটা মেনে নিল নাকি মানল না? কুযুক্তিগুলোকে কুযুক্তি হিসাবে না মানলে তাকেও সুস্থ মানুষ বলা হয় না।

ইন্টারনেট বা অনলাইনে গুগল সার্চের মাধ্যমে বা অন্য সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে “কুযুক্তি” বা “Logical Fallacy” সম্পর্কে সহজেই জানা যায়। আবার www. google translate.com ব্যবহার করে সহজেই যেকোনো ভাষা থেকে অন্য যেকোনো ভাষায় অনুবাদ করা যায়।



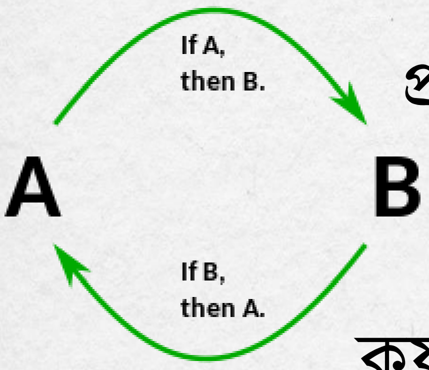
যুক্তি ও প্রমাণ মানুষের জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ। আদালতের ন্যায় বিচারক হওয়ার জন্য বা আমাদের যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য Logical fallacy (কুযুক্তি বা কুতর্ক বা হেত্বাভাস) বিষয়ক ধারনা আবশ্যক। শুরুতেই কুযুক্তি/কুতর্ক/হেত্বাভাস Logical fallacy কাকে বলে, তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এর মানে হচ্ছে, প্রতারণামূলক কিছু, কুতর্ বা কুযুক্তি অথবা ন্যায় কর্মে ফাঁকি দেয়া। যুক্তিবিদ্যায় প্রচলিত কিছু অনর্থক কথার মারপ্যাঁচ কিংবা ভুলযুক্তি/কুযুক্তি/অপযুক্তি বা কুতর্ক জুড়ে দেয়ার প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্যণীয় ছিল, এবং এগুলো সবই যে কুযুক্তি তা দ্বিধাহীনভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। তাই বর্তমান সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিতর্ক বা একাডেমিক আলোচনার সময় নির্ধারিত কিছু কিছু যুক্তিকে কুযুক্তি বা হেত্বাভাস বা logical fallacy হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

সভ্য মানুষ হতে হলে অবশ্যই জানতে হবে, কুযুক্তি বা লজিক্যাল ফ্যালাসি কাকে বলে, ইহা কত প্রকার এবং কী কী। এই আলোচনা সম্পূর্ণটুকুই আন্তর্জাতিক যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক নানা বই থেকে সংগৃহীত। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের প্রায় সকল যুক্তিবাদী মানুষই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত। অনুন্নত, অসভ্য এবং অশিক্ষিত সমাজে যদিও এই কুযুক্তিগুলোই এখনো যুক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু এগুলোর কোনটাই আসলে যুক্তি হিসেবে গণ্য হয় না। সহজভাবে বলতে গেলে, এই ধরণের কুযুক্তিগুলোর সবই যুক্তিবিদ্যার শুরুতেই বাতিল করে দেয়া হয়। সেগুলো আলোচনাতে আসবার যোগ্যতাই রাখে না। সভ্য মানুষ হওয়ার জন্য আপনি যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে থাকলে, এই লেখাটি সবার আগে মন দিয়ে পড়ে নেয়া জরুরি। কারন, হয়তো আপনি নিজেই মনের অজান্তে মানুষকে নানা ধরণের কুযুক্তি বা ফ্যালাসি দিয়ে যাচ্ছেন।

কুযুক্তি বা লজিক্যাল ফ্যালাসি হচ্ছে যুক্তির ভান করে আপনাকে মিথ্যা বা অযৌক্তিক কিছু বোঝাবার কৌশল। যুক্তি প্রদানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, সততার সাথে যুক্তি দেয়া এবং আপনার যুক্তি ভুল হয়ে থাকলে অন্যের শুদ্ধটি দ্বারা তা শুধরে নেয়া। মূর্খের মতো অসৎভাবে যারা যুক্তি প্রদান করে বা চালাকিপূর্ণ যুক্তি তুলে ধরে, তাদের থেকে সাবধান থাকা প্রত্যেক সভ্য মানুষের জন্য খুবই জরুরি। কারন, তারা আপনাকে অযৌক্তিক বা চালাকিপূর্ণ

যুক্তি দেখিয়ে আপনার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাবে। এই ধরণের প্রতারণামূলক যুক্তিগুলো বিশ্লেষণ করে, সেগুলো বাতিল করে সঠিকভাবে গঠনমূলক যুক্তি কিভাবে প্রদান করতে হয় তা শিখতে হলে কুযুক্তি বা লজিক্যাল ফ্যালাসি সম্পর্কে সবারই অবশ্যই জানা থাকা উচিত। আলোচনায় উল্লেখিত উদাহরণগুলোর মধ্যে প্রায় সকল উদাহরণ এমন ধর্মীয় উদাহরণ হিসাবে দেয়া হয়েছে যাতে তা সাধারণ মানুষের সহজে বোধগম্য হয়।

১. চক্রাকার কুযুক্তি (Circular Logic Fallacy) :



প্রশ্ন- ১: হিন্দু ধর্মের বই বেদ যে সত্য তার প্রমাণ কী?

কুযুক্তি দাবী -১: বেদ সত্য কারন ভগবান বলেছেন বেদ সত্য।

প্রশ্ন-২: ভগবান যে সত্য তার প্রমাণ কী?

কুযুক্তি দাবী -২: ভগবান সত্য কারন বেদে লেখা আছে ভগবান সত্য।

উপরের দাবী দুটো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একটি দাবী আরেকটি দাবীকে সত্য প্রমাণ করতে চাচ্ছে। এই দাবী দুটো একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এর কোনটাই প্রমাণিত নয়, তবে একটি আরেকটি দাবীর প্রমাণ হিসেবে

সাক্ষ্য দিচ্ছে। যুক্তিবিদ্যায় একে বলে চক্রাকার যুক্তি বা সার্কুলার লজিক। এটি একটি কুযুক্তি।

২. অপ্রমাণের বোঝা কুযুক্তি (Burden of Proof Fallacy) :

ঘটনা- ১

দাবী: ইউরেনাস গ্রহে আমার দাদার একটি দোতলা দালান আছে।

প্রশ্নঃ ইউরেনাস গ্রহে তোমার দাদার একটি দোতলা দালান আছে, তার প্রমাণ কী?

কুযুক্তিঃ ইউরেনাস গ্রহে আমার দাদার একটি দোতলা দালান নেই, তা তুমি প্রমাণ করতে পারবে?

ঘটনা-২

দাবী: স্যুপারম্যানের সাথে আমার প্রতিদিন কথা হয়।

প্রশ্নঃ স্যুপারম্যান যে আছে তার প্রমাণ কী?

কুযুক্তিঃ স্যুপারম্যান নেই, তা প্রমাণ করতে পারবে?

উপরের প্রতিটি দাবী এবং দাবীর সপক্ষে কুযুক্তিগুলো লক্ষ্য করুন। দাবীকারী নিজ দাবীর সপক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপন না করে বরং প্রশ্নকর্তাকেই তার দাবীটি অপ্রমাণের দাবী জানাচ্ছে। অর্থাৎ, তার কাছে তার দাবী

প্রমাণের যথেষ্ট যুক্তি না থাকায় প্রশ্নকর্তার ওপরেই সে তার দাবী অপ্রমাণের বোঝা চাপাতে চাচ্ছে। যুক্তিবিদ্যায় একে বলা হয় অপ্রমাণের বোঝা কুযুক্তি। উল্লেখ্য, প্রমাণ বা যুক্তি উপস্থাপনের দায় তারই, যিনি দাবী উত্থাপন করেন। অন্য কারও তা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার দায় নেই। অন্য কেউ কারো দাবী অপ্রমাণ না করলেও, কারো দাবী প্রমাণের বোঝা অন্যের কাঁধে চাপাতে চাইলে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ ও যুক্তির অভাবে তার দাবীটিই খারিজ বা বাতিল হয়ে যাবে।

৩. অজ্ঞতার কুযুক্তি (Argument from Ignorance Fallacy) :

দাবী: যেহেতু তুমি জানো না, আমার মাথায় কতগুলো চুল আছে; তাই হিন্দু ধর্মের দেবতা ব্রহ্ম হলেন সৃষ্টিকর্তা।

দাবী: যেহেতু তুমি জানো না, মিশরের পিরামিডগুলো কোনটি কয়টি পাথর দিয়ে বানানো; তাই যৌন সম্পর্ক ছাড়াই যিশু খ্রিস্টের মা ম্যারীর গর্ভে সন্তান হয়েছে।

দাবী: যেহেতু তুমি জানো না, মহাবিশ্বে কতগুলো গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু ইত্যাদি আছে; তাই মুহাম্মদ ঘোড়ায় চড়ে সাত আসমান পাড়ি দিয়ে কয়েক মিনিটেই আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন।

দাবী: যেহেতু তুমি জানো না, প্রশান্ত মহাসাগরে কত লিটার পানি আছে; তাই হনুমান এক লাফে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভারত থেকে শ্রীলঙ্কা পৌঁছে গেছে।

দাবী: যেহেতু কেউ জানে না, আমার ভাইয়ের খুনী কে; তাই হারুন মিয়াই আমার ভাইকে খুন করেছে।

উপরের দাবীগুলো অজ্ঞতার কুযুক্তির কিছু উদাহরণ। ধরুন, কেউ দাবী করলো, তিনিই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন; এবং যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করলো, এই দাবীটি কেউ অপ্রমাণ করতে পারবে না, এবং আরও প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করলো মানুষের অজ্ঞতাকে। যেহেতু পৃথিবীর মানুষ কিছু বিষয় সম্পর্কে এখনও জানে না; বা দাবী উপস্থাপনকারীর ঐ কথাটি এখনও কেউ ভুল প্রমাণ করেনি; সেহেতু তার দাবীটিই সঠিক, এমন যুক্তি দেখানো হলো একটি কুযুক্তি। এটাকে অজ্ঞতার কুযুক্তি বলে।

আগুন সম্পর্কে না জানার কারণে মানুষ প্রাচীনকালে আগুনের পূজা করত। পরবর্তীতে আগুন সম্পর্কে জানার কারণে আগুনকে ভয় করে পূজা করা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর মানুষের এখনও কিছু কিছু বিষয় অজানা আছে। মানুষ অজানাকে জানার চেষ্টা করতে পারে। ধীরে ধীরে জানাও সম্ভব হচ্ছে। তথ্য প্রমাণ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের কোন অজানা বিষয় থাকার অর্থ এই নয় যে, অমুকের দাবীটি সঠিক। যেকোন অজানা বিষয়কে জানার পদ্ধতি হচ্ছে, তা নিয়ে পড়ালেখা করা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তথ্য প্রমাণ যুক্তি দিয়ে জানার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। অমুকে সৃষ্টি করেছে বা তমুকে এমনটি

ঘটিয়েছে তা ধরে নেয়া নয়। কোনো অজানা বিষয় অপ্রমাণিত কোনো কিছুর সপক্ষের যুক্তি বা প্রমাণ হতে পারে না। এটাকে অজ্ঞতার কুযুক্তি বলে।

৪. প্রকৃতিগত কুযুক্তি (Appeal to Nature Fallacy):

এই কুযুক্তিটির গতানুগতিক ব্যবহারটি লক্ষ্য করা যায় যখন "ভাল" এর সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করা হয়। দার্শনিক জি. ই. মুর (১৮৭৩-১৯৫৮) যুক্তি দেন, কোন কিছু প্রাকৃতিক বলে একে "ভাল" বা "নৈতিক" বলে সংজ্ঞায়িত করলে ভুল হবে। এই হেত্বাভাসে প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে ভাল মন্দের সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করা হয় বলেই এর নাম "ন্যাচারালিস্টিক ফ্যালাসি"।

উদাহরণ:

প্রস্তাবঃ প্রাকৃতিকভাবে যেহেতু নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য আলাদা তাই নারী পুরুষকে সমান মনে করা বা সমান অধিকাট দেয়া খারাপ।

কিন্তু, প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে ধরে নিয়ে কোন কিছুকে যদি নৈতিক বা ভাল মনে করা হয়, তাহলে একই যুক্তিতে প্রকৃতি মানুষকে অসুখবিসুখ এবং রোগব্যাধি দেয়। তাই একই যুক্তিতে ধরে নিতে হয়, অসুখ বিসুখ যেহেতু প্রাকৃতিক তাই নৈতিক এবং ভাল। এবং ঔষধের দ্বারা প্রকৃতির কাজে বাঁধা দেয়া এবং অসুস্থের চিকিৎসা করা

নৈতিকভাবে ভুল। তাই বোঝা যাচ্ছে, প্রাকৃতক বা স্বাভাবিক বলেই কোন কিছু নৈতিক এবং ভাল, তা বলা যায় না।

আবার ধরুন, রাস্তাঘাট নির্মান, বিমান গাড়ি চালানো, এগুলো কোনটাই প্রাকৃতিক নয়। বরঞ্চ প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়েই রাস্তাঘাট বানাতে হয়, বিমান গাড়ি ইত্যাদি চালাতে হয়। তাই প্রাকৃতিক তাই ভাল বা নৈতিক, এমনটা দাবী করা একটি কুযুক্তি বা ফ্যালাসি বা লজিক্যাল ফ্যালাসি।

৫. স্বাভাবিক করার আবেদন (Appeal to Normality Fallacy) :

অর্থাৎ, প্রথা / অধিকাংশ মানুষ করতো বা করে এই দোহাই দিয়ে কোন অপরাধকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা। এই কুযুক্তিটি সংঘটিত হয় যখন কী স্বাভাবিক, কী স্বাভাবিক নয়, কী হয়ে আসছে, কী কখনও হয় নি, এর উপর ভিত্তি করে যখন কোন নৈতিক সিদ্ধান্ত টানা হয়, কোনোটাকে ভাল, কোনোটাকে মন্দ বলা হয়। অন্যভাবে বললে, সচরাচর ঘটে কিংবা সচরাচর ঘটে না, সবাই করে কিংবা সবাই করে না, এর ওপর ভিত্তি করে যদি কোন কাজকে নৈতিক/ভাল বা অনৈতিক/মন্দ কাজ বলে সিদ্ধান্ত টানা হয়, তাহলে তাকে আপিল টু নরমালিটি ফ্যালাসি বলা হবে।

উদাহরণ:

১।

দাবী: “১৪০০ বছর আগে পরাজিত বাহিনীর লোকদের হত্যা করে তাদের স্ত্রী ও কন্যাদের তুলে এনে গনিমতের মাল নাম দিয়ে তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক করাটাই স্বাভাবিক ছিল। তাই এই কাজকে খারাপ বলা যাবে না।“

কিন্তু ১৪০০ বছর আগে কোনো কাজ খুবই স্বাভাবিক ছিল, সকলেই করতো, সেই কারণেই তা নৈতিক বা ভাল কাজ বলে গণ্য হতে পারে না।

২।

দাবী: “বাংলাদেশে বেশিরভাগ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিই ঘুষ খায়। তাই ঘুষ খাওয়ায় খারাপ কিছু নেই।“

কিন্তু বেশিরভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারি ঘুষ খেলেই, দুর্নীতি করলেই দুর্নীতি করা বৈধ বা নৈতিক বা ভাল কাজ বলে গণ্য হতে পারে না।

৩।

দাবী: “বাংলাদেশে তারেক জিয়া দুর্নীতি সৃষ্টি করেন নাই। তার আগেও দুর্নীতি হতো। তারেক জিয়ার আগে আওয়ামী লীগও দুর্নীতি করেছে। দুর্নীতিই বাংলাদেশের মত দেশে এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক বিষয়। সবাই করে। পুলিশ, আমলা, কর্মচারী, কর্মকর্তা সকলেই। তাহলে তারেক জিয়া করে কী অপরাধ করেছে?“

কিন্তু তারেক জিয়া দুর্নীতি সৃষ্টি করে নি, তার আগেও দুর্নীতি হতো, সকলেই করতো, সেটাই সেই সময়ে স্বাভাবিক ছিল, এগুলো কোনটাই দুর্নীতিকে ন্যায্যতা দান করে না। দুর্নীতি করা, জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ লুট করা খারাপ এবং সকলে করলেও সেটা খারাপই থাকে। সকলেই করতো – এই দোহাই দিয়ে কাজটিকে ভাল কাজ বলে প্রমাণ করা যায় না।

৪।

দাবী: "হযরত মুহাম্মদ ৬ বছরের আয়শাকে বিয়ে করে ৯ বছরে বৈবাহিক যৌনজীবন শুরু করেন। ঐ সময়ে এটাই ছিল স্বাভাবিক। সকলেই করতো। আওয়্যামে জাহিলিয়াতের যুগেও এটির প্রচলন ছিল। তাই নবী মুহাম্মদ কোন খারাপ কাজ করেন নি।"

কিন্তু ঐ সময়ে সকলে করে থাকলেও, সকলের কাজই খারাপ কাজ বলে গণ্য হবে। সকলে করতো তাই একজনার কোন অসভ্য খারাপ কাজকে ভাল কাজ আমরা বলতে পারি না। সকলে করলেও একটি খারাপ কাজ খারাপই থাকে। এক্ষেত্রে মুহাম্মদকে সর্বকালের অনুসরণীয় আদর্শ মানব বলা একটি কুযুক্তি।

৫।

দাবী: "আমাদের গ্রামে অধিকাংশ নারীরই বাল্যবিবাহ হচ্ছে, এটা এখানে একটা নরমাল ব্যাপার, সুতরাং এটায় ক্ষতির কিছু নেই।"

উপরের একই কারণে এটি কুযুক্তি।

৬. সহিহ (খাঁটি) স্কটসম্যান নহেন কুযুক্তি (No True Scotsman Fallacy):

এটি আরেকটি বহুল প্রচলিত কুযুক্তি। কোনো বিপদ দেখলেই উনি সত্যিকারের স্কটসম্যান নহেন, অর্থাৎ সহিহ বা খাঁটি নহেন, ইত্যাদি বলতে থাকাকে যুক্তিবিদ্যায় সহিহ (খাঁটি) স্কটসম্যান নহেন কুযুক্তি বলা হয়। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করুন –

১।

দাবী: জামাতে ইসলামির একজন নেতা যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

কুযুক্তিঃ উনি সত্যিকারের জামাতি নহেন।

২ ।

দাবী: আওয়ামী লীগের এক নেতা দুর্নীতির দায়ে জেল খাটছেন।

কুযুক্তিঃ উনি সহিহ (খাঁটি) আওয়ামী লীগার নহেন।

৩।

দাবী: মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর বার্মিজরা অত্যাচার চালাচ্ছে।

কুযুক্তিঃ যারা অত্যাচার করছে তারা সহিহ (খাঁটি) বার্মিজ নহেন।

৪।

দাবী: প্যালেস্টাইনে ইসরাইল আবারো আক্রমণ করেছে।

কুযুক্তিঃ ওরা সহিহ (খাঁটি) ইসরাইলী নহেন।

৫।

দাবী: আই.এস. (ইসলামিক স্টেট) জঙ্গিরা অনেক মানুষকে হত্যা করছে।

কুযুক্তি: যারা আই.এস. তারা সহিহ (খাঁটি) মুসলমান নহেন। এটা ইসরায়েলের ষড়যন্ত্র।

৭. ভণ্ডামি আশ্রিত কুযুক্তি (Appeal to Hypocrisy Fallacy):

১।

ধরুন, আওয়ামী লীগ নেতা সজীব ওয়াজেদ জয় বিএনপি নেতা তারেক জিয়াকে বললো, তুমি একজন দুর্নীতিবাজ।

উত্তরে তারেক জিয়া বললো, তুমিও তো দুর্নীতি করো, বা ডোনাল্ড ট্রাম্পও তো দুর্নীতি করে বা এরশাদও তো দুর্নীতি করেছিল।



২।

প্রস্তাব – ইসলামে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা অসম্মানজনক।

কুযুক্তি – হিন্দু ধর্মে নারীর মর্যাদা কতটুকু? সেখানেও তো অসম্মানজনক।

এই ধরণের উত্তর একটি লজিক্যাল ফ্যালাসি, যাকে বলা হয় অ্যাপিল টু হিপোক্রেসি বা ট্যু ক্যুও-ক্যুই। মানে হচ্ছে, ইউ ট্যু বা তুমিও। কিন্তু অন্য আরেকজন দুর্নীতি করলেই প্রথম জনের দুর্নীতির দাবীটি মিথ্যা হয়ে যায় না। বা হিন্দু ধর্মে নারী অসম্মানজনক অবস্থানে থাকলেই ইসলাম ধর্মে নারীর অবস্থান সম্মানজনক তা প্রমাণ হয় না। এই কুযুক্তিটি ধার্মিক সমাজে বহুল প্রচলিত এবং এই যুক্তি দ্বারাই সাধারণত বিপক্ষকে ধরাশায়ী করার চেষ্টা করা হয়। ইসলামি জঙ্গিবাদের সমালোচনার সময় তারা রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর আক্রমণের উদাহরণ তুলে আনেন, কিন্তু রোহিঙ্গা মুসলিমরা নির্যাতিত হয়ে থাকলে ইসলামি জঙ্গিবাদ তাতে গ্রহণযোগ্য হয় না। আরেকটি অন্যায়ের উদাহরণ প্রথম অন্যায়টিকে ন্যায় বানাতে পারে না।

৮. ঈশ্বরের দোহাই দেয়া বা আপিল টু হ্যাভেন কুযুক্তি (Appeal to Heaven Fallacy):

যখন কোন দাবীকে এই যুক্তিতে গ্রহণ করতে বলা হয় যে, “ঈশ্বর এটাই চেয়েছেন” বা “এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা” বা “তিনি ঈশ্বর তাই তিনি এটা করতে পারেন”, তাহলে এই

কুযুক্তিটি সংঘটিত হয়। এই কুযুক্তিটিকে ঈশ্বরের দোহাই বা অ্যাপিল টু হেভেন বলে।

উদাহরণ:

১।

বিচারক: কেন তুমি ওদেরকে হত্যা করেছ?

অভিযুক্ত: কারন ঈশ্বর আমাকে স্বপ্নে এই আদেশ দিয়েছিলেন।

আধুনিক বিচারব্যবস্থার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ, কারন আধুনিক বিচারব্যবস্থা এভাবে কাজ করে না। কিন্তু মুশকিল হল মানব-চিন্তা অনেক সময়ই এভাবে কাজ করে। প্রতিদিনই অনেক মানুষ এই ভেবে কোন কাজ করছে যে ঈশ্বর তাই চান, ঈশ্বর এতে খুশি হবেন, এসব কাজ করলে কোন সমস্যা নেই কারন এটাই ঈশ্বরের বিধান। আর এরকম চিন্তার কারণে অনেকে অন্যের ক্ষতিও করে ফেলেন। আধুনিক বিচারব্যবস্থা এসবের তোয়াক্কা করেনা বলেই হয়তো অন্যের ক্ষতি করার পেছনে এরকম যুক্তি আর খাটে না, অপরাধ তো অপরাধই থাকে।

২।

কেন ইব্রাহীম ও ইসমাইলের গল্পটিকে একটি “অসাধারণ” ইসলাম ধর্মের কাহিনী হিসেবে পড়ানো হয়? লোকটা তো তার জীবিত সন্তানকে প্রায় জবাই করে ফেলেছিল!

কুযুক্তি: কারন ইব্রাহীম আল্লাহর ইচ্ছারই অনুসরণ করছিল। এটা ইব্রাহীমের জন্য অনেক কষ্টকর হলেও সে আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণে এটা করতে যাচ্ছিল। এটা কি অসাধারণ শিক্ষনীয় ঘটনা নয়?

এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে, নিজের সন্তানকে জবাই করতে যাওয়ার গল্প ততক্ষণ পর্যন্তই “অসাধারণ” যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়ে থাকে। ঈশ্বরের ভক্তির জন্য সন্তান হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করলেই সন্তান হত্যা করার চেষ্টা ভাল কাজ হয়ে যায় না, তাতে যতই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ পাক। আর তাই এই গল্পটিও “অসাধারণ” হয় না। কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে এরকম ঈশ্বরের ইচ্ছার ব্যাপারটি আনার অর্থ হলো যুক্তিকে ত্যাগ করা। এক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই প্রধান হয়ে যায়, আর সেজন্য কারও ক্ষতি করার ব্যাপারটি নৈতিকতার ঊর্ধ্বেও চলে যেতে পারে। যেমনটা গল্পে ইব্রাহীমের ক্ষেত্রে হয়েছিল, আর তাই এরকম কুযুক্তি বিপজ্জনকও হতে পারে।

৩।

দাবী: নিজের ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের লোকজন অধস্তন বা নিকৃষ্টতম প্রাণী – এই কথা কোন মানুষ বলেনি, ধর্মগ্রন্থে

স্বয়ং ঈশ্বর বলেছেন। এরকম কথা মানুষ বললে তিনি সাম্প্রদায়িক হবেন, কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু সবার সৃষ্টিকর্তা, তাই তিনি এই কথা বলতেই পারেন।

এখানে মানুষের সাথে ঈশ্বরের একটি পার্থক্য সূচিত করে বলা হচ্ছে যে মানুষ এরকম কথা বললে সাম্প্রদায়িকতা হবে, কিন্তু ঈশ্বর এরকম বললে সাম্প্রদায়িকতা হবে না। ঈশ্বর এই কথাটি বলছে বলেই এটা সাম্প্রদায়িক হবে না, এটা সত্য এবং সঠিক হয়ে যাবে। এই কথাগুলোতেও যুক্তি ত্যাগ করা হয়, এবং এটি অ্যাপিল টু হ্যাভেন নামক কুযুক্তি। এছাড়া ঈশ্বরের এই কথাটি মানুষের উদ্দেশ্যেই বলা, মানুষকে জানানোর জন্য ঈশ্বর যেসব আদেশ দেন তাই ধর্মগ্রন্থে লেখা হয়। যেহেতু ঈশ্বরের ধর্মগ্রন্থে এরকম বিধান দেয়া হয়েছে তাই ঈশ্বরের কথা ভেবে মানুষ এটাই বিশ্বাস করে, আর ঈশ্বর এভাবে বলেছেন বলে অন্য ধর্মের লোকেরা অধস্তন, লেস হিউম্যান বা ঊনমানব এরকম দাবী করাকে ঈশ্বরের দোহাই দেয়া কুযুক্তি বলে।

যেমন ধরুন, হিটলার দাবী করতে পারে, ঈশ্বরের নির্দেশেই সে ৬০ লক্ষাধিক ইহুদি নিধন করেছে। বা মাওলানা মওদুদি যখন আহমদীয়াদের ওপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণের উষ্কানি দিয়েছে, সেও একই দাবী করতে পারে যে, এটি ছিল আল্লাহর আদেশ। তারা বলতেই পারে, ঈশ্বর ভাল বোঝেন বলেই এই কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন। এভাবে আসলে

প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজকে ন্যায্যতা প্রদান করতে পারে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে। সেই কারণে এই যুক্তি কোথাও গ্রহণযোগ্য নয়। এই লজিক্যাল ফ্যালাসি বা কুযুক্তিটি শুধু কুযুক্তিই নয়, বিপজ্জনক ধারণাও বটে।

এই প্রসঙ্গে কথিত ঈশ্বরের আদেশে Deanna Laney murders, Sharon Dalson, আল্লাহর আদেশে রেজওয়ানা হত্যাকাণ্ড, ঈশ্বরের নির্দেশে Samuel Warren Shaffer এর ৮ বছরের বালিকা বিবাহ উল্লেখযোগ্য। এরকম হাজার হাজার ঘটনা রয়েছে যারা ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে নানা অপরাধমূলক কাজ করেছে।

৯. অপ্রাসঙ্গিক তর্কের কুযুক্তি (Red Herring Fallacy):

দাবী: আমার মনে হয় ভুত আছে।

প্রশ্ন: ভুত যে আছে, তার প্রমাণ কী?

দাবী: এই যে আমরা জন্মেছি, মারা যাচ্ছি, এগুলো তো সত্য, তাই না? মারা যে যাচ্ছি, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

উপরের দাবীটি লক্ষ্য করুন। দাবীকারী প্রথমে বললো ভুত আছে। প্রমাণ চাওয়া মাত্রই তিনি আলোচনা ভিন্ন একদিকে নিয়ে গেলেন, যেই আলোচনায় তার কথাগুলো আপাত দৃষ্টিতে যুক্তিপূর্ণ মনে হলেও, তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবেই আসলে জন্ম মৃত্যুর প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। যার

সাথে ভুত থাকা না থাকা সম্পর্কহীন। পরের ধাপে তিনি যতই যৌক্তিক কথা বলুন না কেন, তার সকল যুক্তিই কুযুক্তি বলে বিবেচিত হবে। কারন তিনি মূল প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন।

১০. মিথ্যা উভয়সঙ্কট কুযুক্তি (False Dilemma Fallacy):

ধরুন, কেউ সমাজতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে বাক স্বাধীনতা নেই, সেখানে ধর্ম পালনের অধিকার ব্যক্তিগত পর্যায়ে রাখতে হয় ইত্যাদি। এবং কঠোর সমালোচনার ফলাফল হিসেবে নিয়ে আসছে ইসলামী শরিয়া আইনকে। বোঝাতে চাচ্ছে, যেহেতু সমাজতন্ত্র বাক স্বাধীনতা হরণ করে, তাই দেশে শরিয়া আইনের কোন বিকল্প নেই। যেন মানুষের সমাজতন্ত্র এবং শরীয়া আইন, এই দুইয়ের মধ্যেই পছন্দ করতে হবে। আর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু সত্য হচ্ছে, সমাজতন্ত্র বাক স্বাধীনতা খর্ব করলে শরীয়া আইন তার শতগুণ বেশি করে। মানুষের কাছে সমাজতন্ত্র এবং শরীয়া আইন ছাড়াও অনেকগুলো অপশন রয়েছে। যেমন সোশ্যাল ডেমোক্রেসি। এরকম আরও অনেক সুযোগ রয়েছে। তাই সবগুলো পছন্দ সামনে না আনাকে ফলস ডিলেম্মা বা মিথ্যা উভয়সঙ্কট কুযুক্তি বলা হয়। যুক্তিবিদ্যায় এই চালাকিপূর্ণ কুযুক্তিকে খারিজ করে দেয়া হয়।

১১. খড়ের মানুষ হারানো কুযুক্তি (Straw Man Fallacy):

একজন ব্যক্তি আসলে যা বলেনই নি, সেরকম কিছু তিনি বলেছেন দাবী করে সেই বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে পরাজিত করার যুক্তিকে স্ট্রম্যান ফ্যালাসি বা খড়ের মানুষ বানিয়ে তার সাথে যুদ্ধ করার কুযুক্তি বলে। ধরুন –

বক্তা ১ বলেছেন, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।

বক্তা ২ বলছেন, বক্তা ১ আসলে ফ্রি সেক্স করার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। ফ্রি সেক্স খুব খারাপ। ফ্রি সেক্সে অনেক সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়। (এরপরে তিনি দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ফ্রি সেক্সের ভাল খারাপ বিষয় নিয়ে বক্তব্য দিয়ে গেলেন। অথচ বক্তা ১ ফ্রি সেক্স বিষয়ক কিছু উল্লেখই করেন নি।)

লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, বক্তা ২ হয়তো ফ্রি সেক্সের ভাল খারাপ বিষয়ে কিছু বক্তব্য দিয়ে মাঠ গরম করতে চাচ্ছিলেন, তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা না করে উনি নিজেই বিপক্ষের বক্তার একটি বানানো আর্গুমেন্ট তৈরি করলেন, এবং সেটাকে হারিয়ে দিলেন। একজন যেমন খড় দিয়ে মানুষ বানিয়ে তার সাথে মল্লযুদ্ধ করে যুদ্ধ জয় করার ভান ধরে, খুব বীরত্ব দেখানো হয়েছে বলে সবাইকে বোঝাতে চায়, ঠিক তেমনি, বক্তা ১ যা আসলে বলেনই নি, সেই আর্গুমেন্ট বানিয়ে বক্তা ২ নিজেই যুদ্ধে

জয়লাভ করে বসলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনস্তিত্বের সাথে ফ্রি সেক্স অথবা কোন ধরণের সেক্সই প্রাসঙ্গিক নয়। এরকম যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টাকে খড়ের মানুষ হারানো কুযুক্তি বলা হয়।

১২. পক্ষপাতদুষ্ট নিশ্চিত কুযুক্তি Confirmation Bias Fallacy:

যেহেতু আপনি হিন্দু পরিবারে জন্মেছেন এবং ছোটবেলা থেকে হিন্দু ধর্মকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, তাই আপনার দাবী হচ্ছে, পৃথিবীর প্রায় ৪২০০ টি ধর্মের মধ্যে একমাত্র আপনার ধর্মটিই সত্য এবং সঠিক। বাদবাকি ৪১৯৯ টি ধর্মের সবই ভুয়া এবং বিকৃত। আপনি বাংলাদেশের কোন মুসলিম পরিবারে জন্মালে ঠিক একইভাবে একই যুক্তিতে ইসলাম ধর্মটিই পৃথিবীর একমাত্র সত্য ধর্ম বলে তখন আপনার মনে হতো। যেহেতু কোন ধর্মটি সঠিক তা তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই বাছাই না করে শুরুতেই আপনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, জন্মসূত্রে পাওয়া আপনার ধর্মটিই একমাত্র সঠিক, তাই আপনার দাবী পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। আর আপনার এই যুক্তিটি একটি কুযুক্তি। পৃথিবীর বেশিরভাগ ধার্মিক মানুষই মনে করেন, তিনি যেই পরিবারে ঘটনাচক্রে জন্মেছেন, সেই পরিবারের ধর্মটিই একমাত্র সত্য। তিনি তার ধর্মের সপক্ষে যেসকল

যুক্তি আছে, সেগুলো খুঁজে বের করেন, এবং সেইগুলোই প্রচার করেন। তার ধর্মের বিপক্ষের যুক্তিগুলোকে তিনি এড়িয়ে যান বা বাতিল করে দেন।

১৩। এড হোমিনেম (সারকামস্টেনশিয়াল)

Appeal to Motive Fallacy:

কোন যুক্তির পেছনে যুক্তিদানকারীর স্বার্থ রয়েছে, এমনটা দেখিয়ে যুক্তি বা দাবীকে ভুল বললে বা নাকোচ করলে এই কুযুক্তিটি সংঘটিত হয়। এখানে যুক্তির বিপক্ষে যুক্তি নয়, যুক্তিদানকারী কী উদ্দেশ্যে যুক্তি দিচ্ছে, সেই নিয়েই আলোচনা চলে।

উদাহরণ:

১।

ধরা যাক, ইসলাম ধর্মের শিশু বিবাহ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এরকম অবস্থায় একজন বললো, আপনি ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে যুক্তি দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই আপনি ইহুদী খ্রিস্টানদের থেকে টাকা পয়সা নিচ্ছেন।

– এখানে, ইসলামের পক্ষে যিনি বলছেন, তিনি শিশু বিবাহের ভাল খারাপ দিক নিয়ে যৌক্তিক আলোচনা না করে কী উদ্দেশ্যে কেউ এই যুক্তি দিচ্ছে, কার থেকে টাকা পয়সা

পাচ্ছে, তার দিকে নির্দেশ করছেন। যুক্তিবিদ্যায় একে এড হোমিনেম ফ্যালাসি বা কুযুক্তি বলে। উল্লেখ্য, ইহুদী খ্রিস্টানদের থেকে যদি কেউ টাকা নিয়েও থাকে, তাতেও শিশু বিবাহের বিরুদ্ধে যিনি উপযুক্ত যুক্তি দিচ্ছেন, সেই যুক্তিটি ভুল প্রমাণিত হয় না।

১৪. প্রাধিকারের কুযুক্তি Argument from Authority Fallacy:

দাবী: অমুক বিজ্ঞানী ভাগ্য পরিবর্তনের আংটি পরতো, তাই আংটি ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে।

দাবী: অমুক দর্শনের পণ্ডিত পীরবাবার পানিপড়া খেতো, অতএব পানিপড়া খেলে অসুখ সারে।

দাবী: অমুক বিখ্যাত ডাক্তার ওঝার শরণাপন্ন হয়েছিল, অর্থাৎ ওঝা রোগ সারাতে পারে।

উপরের দাবীগুলোকে প্রাধিকারের কুযুক্তি বলে। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে এক ধরণের কর্তৃত্ব আরোপ করা, এবং তার নামকে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করাকে কুযুক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। এই ধরণের ঘটনা কোনকিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে পারে না। কোন বিখ্যাত মানুষ কী বলেছেন বা করেছেন বা শুনেছেন, তার ওপর যুক্তি নির্ভরশীল নয়। যেমন, বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এর নাস্তিক হওয়া নাস্তিক্যবাদের যথার্থতার কোন প্রমাণ নয়। আবার

একইভাবে, নিউটনের আস্তিক থাকাটিও ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষের প্রমাণ নয়। ঈশ্বর আছে কী নেই, তা স্টিফেন হকিং বা আইজ্যাক নিউটনের ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসের ওপর নয়, ঈশ্বরের সপক্ষে কতটুকু যুক্তি রয়েছে তার ওপর নির্ভরশীল। তা ব্যক্তির বিশ্বাস অবিশ্বাস নিরপেক্ষ। কে কত বড় বিখ্যাত বা অখ্যাত বা পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞ, তার উল্লেখ করে তাদের বিশ্বাস বা অবিশ্বাসকে প্রমাণ করা যায় না। তবে, স্টিফেন হকিং বা আইজ্যাক নিউটন যেসমস্ত যুক্তি বা প্রমাণ ব্যবহার করেছেন, সেগুলো যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু যুক্তিহীনভাবে বিখ্যাত কারও নাম উল্লেখ করে কোন দাবী করলে সেই দাবীকে প্রাধিকারের কুযুক্তি বলা হয়।

১৫. জনপ্রিয়তার কুযুক্তি:

Argument From Popularity/ Argumentum ad Populum Fallacy

দাবী: ইসলাম ধর্ম যদি সত্য নাই হয়ে থাকে, তাহলে পৃথিবীর ১৬০ কোটি মুসলমান কেন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে?

দাবী: বিবর্তনবাদ যদি সত্য হয়েই থাকে, তাহলে পৃথিবীর সব আব্রাহামিক ধর্মের ধার্মিক মানুষ কেন তা অবিশ্বাস করে?

জনসংখ্যার কত অংশ কী বিশ্বাস করে, বা কোন মতবাদটি কতটুকু জনপ্রিয়, যুক্তি তার ওপর নির্ভর করে না। যুক্তি বা বিজ্ঞান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয় যে, কত মানুষ তা মানলো সেটার ওপর নির্ভর করবে। যুক্তি শুধু তথ্য প্রমাণ এবং যুক্তির যথার্থতার ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর সকল মানুষও যদি অযৌক্তিক কিছু বলে, শুধু একজন যদি যৌক্তিক কথা বলে, তাহলে ঐ একজন ব্যক্তিই সঠিক। যেমন, পৃথিবীর প্রায় দুইশত কোটি মানুষ ইসলামে বিশ্বাস করলে সেটা যেমন কোন যুক্তি নয়, ঠিক একইভাবে, পৃথিবীর বাকি প্রায় ছয়শত কোটি মানুষ যেহেতু ইসলামে বিশ্বাসী নয়, সেহেতু ইসলাম মিথ্যা, সেটাও ভুল যুক্তি বা কুতর্ক বা হেত্বাভাস বা লজিক্যাল ফ্যালাসি। কোন দাবীর সত্যতা সেই দাবীটির তথ্য প্রমাণ এবং যুক্তির ওপর নির্ভরশীল, তা কতজন বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করে তার ওপর নয়।

১৬. ভুল উপমার কুযুক্তি False Analogy Fallacy:

এই ফ্যালাসিটি তখনই হয় যখন কেউ দুটি বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে তুলনা করে তাদের মধ্যকার একটি সাদৃশ্যের ওপর নির্ভর করে আরেকটি সাদৃশ্য অনুমান করে। দুটি বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে একটি ক্ষেত্রে মিল আছে মানে এটা নয় যে, তাদের মধ্যে অপর আরেকটি ক্ষেত্রে অবশ্যই মিল থাকবে। একটি মোবাইল ফোন আর একটি জীবদেহ উভয়ই অত্যন্ত

জটিল মানে এটা নয় যে, মোবাইল ফোনটি কোনো কারিগরের অবদান বলে জীবদেহটিও কোনো কারিগরের অবদান হবে। এই যুক্তি অনুসারে আমরা দাবি করতে পারিঃ

- ছাগল স্তন্যপায়ী প্রাণী,
- ছাগল কাঁঠাল পাতা খায়।
- মানুষ স্তন্যপায়ী প্রাণী,
- অতএব, মানুষও কাঁঠাল পাতা খায়।

অবশ্যই, ছাগল এবং মানুষ উভয়ই স্তন্যপায়ী প্রাণী মানে এটা নয় যে, 'ছাগল এবং মানুষ উভয়ই কাঁঠাল পাতা খায়।'

দাবী : "ঘড়ি খুব জটিল একটি বস্তু, সেকারণে একটি ঘড়ি দেখে আমরা বুঝতে পারি, এটি কোনোভাবেই আপনা-আপনি তৈরি হয়নি, বরং কোনো কারিগর তৈরি করেছেন। যেহেতু জীবদেহ বা আমাদের এই মহাবিশ্বও অত্যন্ত জটিল, সেহেতু জীবদেহ বা আমাদের এই মহাবিশ্বও আপনা-আপনি তৈরি হয়নি, বরং কোনো কারিগর তৈরি করেছেন। একটি ঘড়ির জন্য যেমন একজন কারিগর প্রয়োজন, তেমনি জীবজগৎ বা মহাবিশ্বের জন্যও একজন ঈশ্বর প্রয়োজন।"

একটি ঘড়ি দেখে বোঝা যায়, এটি কোনোভাবেই আপনা-আপনি তৈরি হয়নি, বরং একজন কারিগর তৈরি করেছেন। তার কারন, আমরা আগে থেকেই জানি, একটি ঘড়ি

আপনা-আপনি তৈরি হয়না, একজন কারিগর তৈরি করলেই তৈরি হয়।

একজন কারিগর দ্বারা একটি ঘড়ি তৈরি হওয়ার অসংখ্য উদাহরণ থাকলেও, একজন কারিগর ছাড়া আপনা-আপনি একটি ঘড়ি তৈরি হওয়ার একটিও উদাহরণ নেই। অপরদিকে, প্রাকৃতিকভাবে প্রকৃতিতে জীবদেহ জন্ম নেওয়ার অসংখ্য উদাহরণ থাকলেও, একজন কারিগর দ্বারা জীবদেহ তৈরি হওয়ার একটিও উদাহরণ আমরা খুঁজে পাই না।

একটি ঘড়ির জন্য অবশ্যই একজন কারিগর প্রয়োজন আর তার কারন, একটি ঘড়ি প্রাকৃতিকভাবে প্রকৃতিতে জন্ম নিতে পারেনা, একটি অপর একটিকে জন্ম দিতে পারেনা। তাই, একটি ঘড়ি একজন কারিগর তৈরি করলেই তৈরি হয়। অপরদিকে, প্রাণী, উদ্ভিদ কিংবা প্রকৃতিতে বিদ্যমান সবকিছুই আমরা প্রাকৃতিকভাবে প্রকৃতিতে জন্ম নিতে দেখি আর এই জন্ম নেওয়ার ঘটনায় কোনো কারিগরের উপস্থিতি খুঁজে পাই না। অর্থ্যাৎ, একটি ঘড়ির জন্য অবশ্যই একজন কারিগর প্রয়োজন মানে এটা নয় যে, জীবজগৎ কিংবা মহাবিশ্বের জন্যও অবশ্যই একজন কারিগর প্রয়োজন।

অর্থ্যাৎ, ঘড়ি, মোবাইল ফোন, যানবাহন, রোবট ইত্যাদি মানবসৃষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে কারিগরের প্রয়োজনীয়তা একটি বাস্তবতা হলেও জীবজগৎ, গ্রহ-নক্ষত্র কিংবা মহাবিশ্বের

ক্ষেত্রে কারিগরের প্রয়োজনীয়তা কেবলই একটি অনুমান। আপনি কেবল অনুমান করে নিতে পারেন জীবজগৎ বা মহাবিশ্বের পেছনে একজন কারিগরের অবদান আছে। আর এই অনুমানের অর্থ, জীবজগৎ বা গ্রহ-নক্ষত্র কিংবা মহাবিশ্বের জন্মরহস্য আপনি জানেন না এবং সেই অজানা স্থান পূরণ করতেই একজন কারিগর বা ঈশ্বর অনুমান করে নিয়েছেন।

তাছাড়া, একজন ঘড়ি-নির্মাতা শূন্য থেকে ঘড়ির জন্ম দেন না। একটি ঘড়ি তৈরিতে প্রকৃতিতে বিদ্যমান উপাদানসমূহই ব্যবহৃত হয়। আর প্রকৃতিতে বিদ্যমান উপাদানসমূহ অবশ্যই একজন ঘড়ি-নির্মাতার সৃষ্টি নয়।

১৭. কুপ্রশ্নের কুযুক্তি Begging the question:

দাবী: আপনি কেন খুন করেছেন? (উনি খুন করেছেন কিনা তা প্রমাণের আগেই)

দাবী: আপনি আগে যেমন চুরি করতেন এখনো কী করেন?

দাবী: আল্লাহ না থাকলে কোরানে আল্লাহর কথা লেখা থাকবে কেন?

দাবী : হনুমান না থাকলে এতো হনুমানের মন্দির আছে কেন?

উপরের দাবী প্রথম ও দ্বিতীয় দাবীগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে, যিনি প্রশ্ন করেছেন, তিনি শুরুতেই ধরে নিয়েছেন, যাকে প্রশ্ন করেছেন তিনি খুনি, বা তিনি চোর। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে তিনি প্রশ্ন করেছেন, যেই প্রশ্নটিই ভুল। যদি আগে থেকেই শ্রোতা খুনি বা চোর প্রমাণিত না হয়ে থাকে, তাহলে এই ধরণের যুক্তিকে কুযুক্তি হিসেবেই গণ্য করা হয়।

তৃতীয় দাবীতে, উনি ধরে নিয়েছেন কোরানে যা লেখা তা সত্য, এবং আল্লাহ না থাকলে কোরানে আল্লাহর কথা কেন লেখা থাকবে? যুক্তিবিদ্যায় এরকম যুক্তি প্রদানকে কুযুক্তি বা ফ্যালাসি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১৮. তালগাছ আমার কুযুক্তি Argument from final Consequences:

উপস্থাপিত যুক্তি তথ্য প্রমাণ যাই হোক না কেন, যুক্তিতর্কের ফলাফল আপনি আগেই নির্ধারণ করে সেই বিশ্বাসে স্থির থাকলে তাকে আমরা বলি আর্গুমেন্ট ফরম ফাইনাল কন্সিকুয়েন্সেস। ধরুন আপনার বিশ্বাস হচ্ছে, বিবর্তনতত্ত্ব মিথ্যা। আপনি বিবর্তনতত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক করতে আসলেন, এবং বিবর্তনের সপক্ষে সমস্ত তথ্য প্রমাণ যুক্তি শোনার পরেও, তার বিপরীতে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ যুক্তি দিতে ব্যর্থ হওয়ার পরেও আপনি বলতে থাকলেন, যত যাই হোক,

বিবর্তনতত্ত্ব মিথ্যা। কারন আপনার আস্থা যুক্তি বা প্রমাণে নয়, আপনার আস্থা বিশ্বাসে। এরকম অবস্থায় আপনার অবস্থানকে তালগাছবাদী কুযুক্তি বা ফ্যালাসি বলা হবে।

১৯.পক্ষপাতদুষ্ট নিশ্চিত কুযুক্তি Confirmation Bias Fallacy:

যেহেতু আপনি মুসলিম পরিবারে জন্মেছেন এবং ছোটবেলা থেকে ইসলাম ধর্মকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, তাই আপনার দাবী হচ্ছে, পৃথিবীর ৪২০০ টি ধর্মের মধ্যে আপনার ধর্মটিই একমাত্র সত্য এবং সঠিক। বাদবাকি সবই ভুয়া এবং বিকৃত। আপনি ভারতের কোন হিন্দু পরিবারে জন্মালে ঠিক একইভাবে একই যুক্তিতে হিন্দু ধর্মটিই পৃথিবীর একমাত্র সত্য ধর্ম বলে তখন আপনার মনে হতো। যেহেতু আপনি কোন ধর্মটি সঠিক তা তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই বাছাই না করে শুরুতেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, জন্মসূত্রে পাওয়া আপনার ধর্মটিই একমাত্র সঠিক, তাই আপনার দাবী পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। তাই এই যুক্তিটি একটি কুযুক্তি বা ফ্যালাসি। পৃথিবীর বেশিরভাগ ধার্মিক মানুষই মনে করেন, তিনি যেই পরিবারে ঘটনাচক্রে জন্মেছেন, সেই পরিবারের ধর্মটিই একমাত্র সত্য। তিনি তার ধর্মের সপক্ষে যেসকল যুক্তি আছে, সেগুলো খুঁজে বের করেন, এবং

সেইগুলোই প্রচার করেন। তার ধর্মের বিপক্ষের যুক্তিগুলোকে তিনি এড়িয়ে যান বা বাতিল করে দেন।

২০. স্ববিশেষ মিনতি কুযুক্তি Special Pleading Fallacy:

আপনার দাবী: সব কিছুরই স্রষ্টা থাকতে হবে। স্রষ্টা ছাড়া কোনকিছু এমনি এমনি হওয়া সম্ভব না।

প্রশ্নঃ তাহলে স্রষ্টার সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে? কে করেছে? তিনি কী এমনি এমনি হয়েছেন?

দাবী: হ্যাঁ তিনি এমনি এমনিই হয়েছেন। তার কোন স্রষ্টার প্রয়োজন নেই। তিনি স্বয়ম্ভু, স্বয়ংসম্পূর্ণ।

প্রশ্নঃ কিন্তু আপনি কিছুক্ষণ আগেই তো বললেন, সবকিছুরই স্রষ্টা থাকতে হবে। সেই একই যুক্তিতে, স্রষ্টার স্রষ্টা না থাকাটা আপনার যুক্তির বরখেলাপ হয়ে গেল না?

দাবী: আল্লাহ একটি স্পেশাল ক্যারেকটার। উনি সৃষ্টির উর্ধ্বে। উনার স্রষ্টার প্রয়োজন নেই।

উপরের দাবী অনুসারে, প্রথমে তিনি একটি প্রস্তাব দিয়েছেন যে, সবকিছুরই স্রষ্টা থাকা অত্যাবশ্যক। পরে তিনি নিজেই আবার আল্লাহ বা ঈশ্বরকে সেই প্রস্তাবের বাইরে কিছু স্পেশাল সুবিধা দেয়ার দাবী জানিয়েছেন, এই বলে যে, উনি এই প্রস্তাব বা নিয়মের উর্ধ্বে। এটি একটি কুযুক্তি। একে বলা হয় স্পেশাল প্লিয়েডিং ফ্যালাসি। যখন কারও দেয়া সূত্র

বা প্রস্তাব বা রুল সে বা অন্য কেউ ভঙ্গ করে, এবং সেই ভঙ্গ করাকে তিনিই স্পেশাল কিছু সুবিধা বলে চালিয়ে দিতে চান, তাকে আমরা স্ববিশেষ মিনতি কুযুক্তি বা ফ্যালাসি বলতে পারি।

২১. ব্যাখ্যা ও অজুহাত বা ন্যায্যতা প্রতিপাদনকে গুলিয়ে ফেলা Confusing an explanation with an excuse:

কোন ঘটনার ব্যাখ্যা (explanation), অজুহাত (excuse) এবং ন্যায্যতা প্রদান(justification) তিনটি আলাদা বিষয়। কোন ঘটনার ব্যাখ্যাকে তার ন্যায্যতা প্রতিপাদন বা অজুহাত হিসেবে মনে করলে এই হেত্বাভাস হয়। অনেক মানুষই নানা ধরণের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তথাকথিত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে, যা আসলে ব্যাখ্যা নয়, এক ধরণের অজুহাত। কোনটি ন্যায্যতা প্রতিপাদন, ব্যাখ্যা আর কোনটি অজুহাত, তা গুলিয়ে ফেলা অনেক মানুষেরই স্বভাব।

উদাহরণ :

১।

বক্তা ১ – পাকিস্তানীরা ১৯৭১ সালে বাঙলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছিল।

বক্তা ২ – আপনার এইসব ঘটনার ব্যাখ্যা জানতে হবে। পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে হবে। প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে হবে! সেসব না বুঝে আপনি এই কথা বলতে পারেন না।

বক্তা ১ – গণহত্যার আপনি কী ব্যাখ্যা দিতে পারেন?

বক্তা ২ – ঐ সময় খুব কঠিন সময় ছিল। ভারতের দালালরা পাকিস্তানকে ভাঙতে চেয়েছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা চেয়েছিল পাকিস্তানের ক্ষতি করতে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন হয়েছিল জানেন? সেই সময়ে কিছু বাঙালি দুর্বৃত্ত পাকিস্তানের সংবিধান লঙ্ঘন করেছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। সেই সময়ে দেশপ্রেমিক পাক সেনাবাহিনী কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করে।

লক্ষ্য করে দেখুন, একটি গণহত্যাকে ন্যায্যতা প্রদান(Justification) করতে বক্তা ২ নানা রকম অজুহাত তৈরি করছেন। গণহত্যার সপক্ষে তিনি অজুহাত তৈরি করে সেগুলোকে ব্যাখ্যা মনে করছেন। কিন্তু ন্যায্যতা প্রদান, ব্যাখ্যা এবং অজুহাত একদমই আলাদা বিষয়। এই দুটো গুলিয়ে ফেলাকে Confusing an explanation with an excuse বলা হয়। উল্লেখ্য, গণহত্যা বা জাতিগোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায় ধরে নিধন চালানো কোন ব্যাখ্যাতেই বৈধ বলে গণ্য হয় না। কোন অবস্থাতেই ন্যায্যতা পায় না।

২।

– ভাবি, আপনার ছেলে কিন্তু আমাকে মোটেও সম্মান করেনা।

– কারন সে মনে করে আপনার “আপনার চেহারা ডাইনির মত, যে বাচ্চাদের সহ্য করতে পারে না”।

– কিন্তু এটা কোন অজুহাত হতে পারে না।

– না, এখানে অজুহাতের কিছু নেই, এটা কেবলই তার আপনাকে পছন্দ না করার কারন।

এখানে বাচ্চাটি মহিলাটিকে কেন সম্মান করে তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে মাত্র, কিন্তু বাচ্চাটি যে ঠিকই ভাবছে বা ব্যায্য কাজটি করছে বা বাচ্চার ভাবনাটাই যে ঠিক বা ন্যায্য সেটা বলা হয় নি, যা মহিলাটি ধরে নিয়েছিলেন।

৩।

– তুমি কেন বিগফুটকে মানুষ ও বানরের মধ্যকার মিসিং লিংক বলে মনে করছ?

– কারন বিবর্তনগত প্রক্রিয়ায় দুটো প্রজাতির মধ্যবর্তী প্রজাতিকেই মিসিং লিংক বলে।

এখানে মিসিং লিংক কাকে বলে তার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, মানে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, কিন্তু কেন সে বিগফুটকেই মিসিং লিংক বলে মনে করে এর ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা হয়নি।

৪।

– ধর্ষণের পিছনে বিবর্তনগত কারন রয়েছে। জীববিজ্ঞানী থর্নহিল ও এনথ্রোপলজিস্ট পালমার বলেন, একটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ হারেম-বিল্ডিং স্ট্রাগলের কারণে লুজাররা ধর্ষণকে বিকল্প জিন প্রমোটিং স্ট্র্যাটেজি হিসেবে ব্যবহার করলে সুবিধা পাওয়া যায়, আর এর প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মে আসায় পুরুষেরা ধর্ষণের প্রবণতা লাভ করেছে।

– এভাবে বলে তুমি ধর্ষণকে জাস্টিফাই(Justification) করছ, যেন ধর্ষণ খুব ন্যাচারাল, এটা হতেই পারে!

ধর্ষণের ইভোল্যুশনারি এক্সপ্লানেশন ধর্ষণের ব্যাখ্যা দেয়, অর্থাৎ মানুষ কেন ধর্ষণপ্রবণ হয় তার ব্যাখ্যা এখান থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা কখনই ধর্ষণকে জাস্টিফাই করে না, বা ন্যায্যতা প্রদান করে না। অর্থাৎ ধর্ষণের পেছনে প্রাকৃতিক কারনও রয়েছে বলেই এটা নৈতিক এমন কিছু বলে না। আর সেই সাথে ইভোল্যুশন থেকে আসা প্রবণতা ধর্ষণের জন্য কোন এক্সকিউজ বা অজুহাতও হতে পারে না। এটা তাই অপরাধই থাকবে, কারন মানুষের মধ্যে ধর্ষণ প্রবণতা থাকলেও নিজেকে কন্ট্রোল করার অপশন আছে। বিবর্তনের দ্বারা মানুষ নৈতিকতা ও সামাজিকতার বৈশিষ্ট্যই লাভ করেছে। এছাড়া মানুষের আচরণ কেবল জিনই নয়, পরিবেশও নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া অপরাধ অর্থ সমাজের জন্য ক্ষতিকর কাজ, আর অপরাধী অর্থ যে এই ক্ষতিকর কাজটি করেছে।

রেস্টোরেটিভ জাস্টিসের বিধান অনুসারে অপরাধী যাতে অপরাধ থেকে নিবৃত হয় তাই শাস্তির প্রয়োজন, যেখানে শাস্তি অপরাধীকে অপরাধ থেকে নিবৃত করবার একটি প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে কেন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তাতে কিছু আসে যায় না, অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, এখন অপরাধীকে অপরাধ থেকে নিবৃত করার ব্যবস্থা করতে হবে, এটাই মুখ্য, তাই এক্সকিউজ বা এক্সপ্লানেশনে কিছু আসছে যাচ্ছে না।

তবে বৈজ্ঞানিক কারন অনুসন্ধানে এবং মানুষের চরিত্র বুঝবার জন্য স্বাধীনভাবে বিবর্তনগত কারন অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে যেখানে নৈতিক সিদ্ধান্ত আরোপনের মাধ্যমে এটা ঠিক কি ভুল- এই বিষয়ক মন্তব্য করার কিছু নেই, বরং এই অনুসন্ধান অপরাধ নিবৃতির কাজে সহায়তা করতে পারে, যা সমাজের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

উপরের উদাহরণে একটি ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান এবং সেই ঘটনাকে জাস্টিফাই করার জন্য ব্যাখ্যা প্রদানকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। তাই এটি একটি লজিক্যাল ফ্যালাসি।তাহলে আমরা ব্যাখ্যা প্রদান এবং অজিহাতের মধ্যে পার্থক্য কীভাবে করবো?

অজুহাত > ধরুন, যখন কেউ বলবে, মেয়েটি ধর্ষিত হয়েছে, এখানে মেয়েটিরই দোষ ছিল। মেয়েটাই হয়তো কম কাপড়

পরেছে, ছেলেটিকে উত্তেজিত করেছে, মেয়েটারই চরিত্রে দোষ আছে ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা > লক্ষ বছরের বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে ধর্ষণের ইচ্ছা পরিলক্ষিত হয় বলে গবেষনায় দেখা গেছে। বিবর্তনের ধাপে ধাপে যেই প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটছে, সেখানে শারীরিকভাবে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী একজন পুরুষ, যারা সাধারণত অন্য পুরুষের সাথে লড়াইতে কুলিয়ে ওঠে নি, তারা অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী নারীদের ওপর যৌন নির্যাতন চালিয়েছে। সেখান থেকে হওয়া বাচ্চারা সেইসব জিন বহন করেছে। সেই সাথে পারিপার্শ্বিক ঘটনা, সামাজিক নিয়মকানুন এবং শিক্ষা সেই সব বাচ্চাদের ভেতরে সেই সব জিন সচল করতে সাহায্য করেছে।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যখন দেয়া হচ্ছে, সেটি কাজটির ন্যায্যতা প্রদান নয়। এখানে কোনভাবেই কাজটি নৈতিক নাকি অনৈতিক, সেই সিদ্ধান্তে যাওয়া হয় না। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও তা নয়। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এইসব ঘটনার পেছনে কারন অনুসন্ধান করা। যখন কারনগুলো সঠিক এবং বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে, সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করা যাবে তার উপায়ও মিলতে থাকবে।

২৩. চেরি পিকিং কুযুক্তি Cherry picking fallacy:

যখন আমরা কোন বিষয়ে বিভিন্ন রকম এভিডেন্স, ডেটা বা সম্ভাবনা থেকে আমাদের অনুকূলে যায় এরকম ডেটা বা এভিডেন্সকেই বা সম্ভাবনাকেই গ্রহণ করি তখন এই হেত্বাভাসটি সংঘটিত হয়।

উদাহরণ:

১।

দাবী: কোরানে বলা হয়েছে, পৃথিবী এবং আকাশ(মহাবিশ্ব) এক সময় একসাথে ছিল। আল্লাহ পাক তা আলাদা করেন যা বিগ ব্যাং তত্ত্বের দিকেই নির্দেশ করে।

প্রশ্নঃ বিগ ব্যাং তত্ত্বে কোথাও বলা হয় নি, পৃথিবী এবং মহাবিশ্ব এক সময় একই বিন্দুতে ছিল। আমাদের অবজারভেবল মহাবিশ্বের বয়স ১৩.৮ বিলিয়ন বছর। এবং পৃথিবীর বয়স ৪.৫৪৩ বিলিয়ন বছর। অর্থাৎ, পৃথিবী নামক কোন কিছুর অস্তিত্ব মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রায় ৯ বিলিয়ন বছর পরের ঘটনা। তাহলে, পৃথিবী এবং মহাবিশ্ব একসাথে ছিল, এরকম বলার পেছনে যুক্তি কী?

এছাড়াও, কোরান অনুসারে পৃথিবীকে আগে সৃষ্টি করা হয়েছে(সুরা ফুসসিলাত আয়াত ৯-১২), এরপরে আল্লাহ আকাশের দিকে মনোযোগ দেন। অর্থাৎ আকাশে আমরা যা দেখতে পাই, কোরান অনুসারে সে সবের বয়স পৃথিবী থেকে কম। অথচ, আমাদের কাছে এরকম তথ্য প্রমাণ

রয়েছে যে, মহাবিশ্বের অসংখ্য নক্ষত্র পৃথিবীর চাইতে অনেক পুরনো, অনেক প্রাচীন। তাহলে, কোরানের দাবীগুলো সত্য কীভাবে?

> লক্ষ্য করুন, প্রথম কথাটির দাবীদার চেরি পিকিং করছেন। অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক তথ্যের সাথে যতটুকু মিলছে, ততটুকুই উনি বলছেন। অন্যান্য বিষয়াদি উহ্য রেখে। তাই এটি একটি ফ্যালাসি, যাকে আমরা বলি চেরি পিকিং।

২।

আমাদের পলিটিকাল ক্যান্ডিডেট তার আয়ের ১০% অভাবীদেরকে দান করেন, প্রতি রবিবার চার্চে যান, এবং সপ্তাহে একদিন হোমলেস শেল্টারে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন। তিনি একজন সৎ ও যোগ্য ক্যান্ডিডেট।

এখানে যে বিশেষগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলোই যে তার সকল বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করবে এমন কোন কথা নেই। হতে পারে তিনি অভাবী সেক্স ওয়ার্কারকে নিজের লাভের বিনিময়ে অর্থ দান করেন, প্রতি রবিবার চার্চ থেকে বেরিয়ে পাশের স্ট্রিপক্লাবে যান, আর প্রতি সপ্তাহে একদিন হোমলেস শেল্টারে যাবার কারন সেখানে ড্রাগ ডিলারদের ঠেক বসে।

৩।

– আপনার সিভিতে লেখা যে আপনি খুব হার্ড ওয়ার্কার, সব কিছুতে আপনার অনেক মনোযোগ, এবং দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে আপনার কোন সমস্যাই নেই।

– ইয়েস স্যার।

– আমি আপনার আগের অফিসের বসের সাথে কথা বলেছি। তিনি বললেন, আপনি বারবার বিভিন্ন জিনিস পরিবর্তন করেন যা পরিবর্তন করা উচিৎ নয়, আপনি অন্যের প্রাইভেসি নিয়ে খুব একটা কেয়ার করেন না, আর কাস্টোমার রিলেশনের ক্ষেত্রে আপনার স্কোর খুবই খারাপ।

– ইয়েস স্যার। এগুলোও সত্যি।

– খুব ভাল। আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া টিমে তোমাকে স্বাগতম!

সিভি, রেজিউম এসব চেরি পিকিং ইনফরমেশনের ক্লাসিক উদাহরণ। একটি রেজিউমে কেবল এই লেখা থাকে যে কেন আপনি পদটির জন্য যোগ্য। তবে বেশিরভাগ নিয়োগদাতাই বোঝেন যে এগুলো একপাক্ষিক, তাই তারা আরও বেশি এভিডেন্সের জন্য ইন্টারভিউ ও রিকমেন্ডেশন এর দ্বারস্থ হন।

৪।

লোকটি ধর্ষকদের গণপিটুনির বিরুদ্ধে লিখছেন, নিশ্চই তিনি ধর্ষণ সমর্থন করেন ও তাদের প্রতি তার সমবেদনা কাজ করে।

ধর্ষকদের প্রতি সমবেদনা কাজ করা, ধর্ষকদের প্রতি সমর্থন থাকে, এসব ধর্ষকদেরকে গণপিটুনি দেবার বিরোধিতার কারন হতেই পারে, কিন্তু এটাই এর একমাত্র কারন নয়। মব জাস্টিস সমর্থন না করা, বিচারহীনতার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে থাকা, অপরাধীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগে বিশ্বাস করা ইত্যাদি অনেক কারন থাকতে পারে এটা নিয়ে লেখার। কিন্তু এদের মধ্যে নিজের অনুকূলে কাজ করে এমন একটি সম্ভাবনা নিয়েই যদি দাবী করা হয় তাহলে চেরি পিকিং কুযুক্তি ঘটবে।

লেখাটির উৎস:

Chintar Mukti - চিন্তার মুক্তি

সংশয় ডট কম

এমাসের কৌতুক/মিম


বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার !
সব কোরানে লেখা আছে !
তার মানে,মোল্লারা,,,
কোরান পড়ে কিছুই বোঝে না !!
যদি বুঝতো,তাহলে,,
তারাই,পৃথিবীর সবথেকে বড়
"বিজ্ঞানী" হতো !!



কবিতা:

দেশের কথা

-জা মা ল আ ন সা রী

সততার কোনো মূল্য নেই মিথ্যের কারাগারে
নির্দয়ে সে একটু একটু করে গলা টিপে মারে।

দুর্নীতি যেখানে আকাশচুম্বী,চোর ডাকাতে ভরা
সুবিচারের আশা, সে যে শুধুই কষ্টকল্পনা করা।
কল- কারখানায়, হাটে- বাজারে যেখানেই যান
দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, মস্তানদের ইয়া— সন্মান।

নীতি-আদর্শ অক্ষুন্ন রেখে চলা বড়ই কঠিন কাজ
দেশ হাঁটছে অন্ধকারে, নেতা গুলোও দূর্নীতিবাজ।
কি আর বলল দেশের কথা? লিখে শেষ হবে নাই
বড় ফুল আর ছোট ফুল চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।



নষ্ট ধর্ম

-সজল কান্তি টিকাদার

ভগবান বলে নাইতো কিছুই
কর্মে জগৎ চলে---
তবে কেন তাকে পাবার আশায়
ভাসছো চোখের জলে?
মন্দির মসজিদ গীর্জাতে গিয়ে
অঢেল টাকা ঢালি

ভাবছো তোমার পূন্য হয়েছে
সেই গুড়েতে বালি!
সেইসব টাকা খায় পুরোহিত
খায় বামুনের দল;
পূজোআচ্চা সব লোক দেখানো
পৈতেধারীর ছল।
তোমার টাকাতে পান্ডারা সব
করছে গাড়ী বাড়ী
তবু কি তুমি বোকার মতন
ছুটবে পিছন তারই?
অং বং চং মন্ত্র তাদের
বোঝা যায়না কিছু!
ভন্ড এসব ধর্মের কাছে
কোরোনা মাথা নীচু।

যতটাকা তুমি খরচা কর
ধর্মের নাম নিয়ে
সিঁকি ভাগ তার দাও যদি
ফুটপাতেতে গিয়ে

দেখবে তাদের মুখেতে হাসি

চোখেতে খুশীর আলো

ওরা তোমাকে আপন ভেবে

বাসবে কতই ভালো।

ফুটপাতেতে থাকে যারা সব

পেটেতে আগুন জ্বলে

এসব দেখেও কেন গো তুমি

মিশছো ভন্ড দলে?

মানুষের রক্ত থাকে যদি তোমার

গায়েতে একটু খানি---

মানুষ হয়ে কোরো নাগো আর

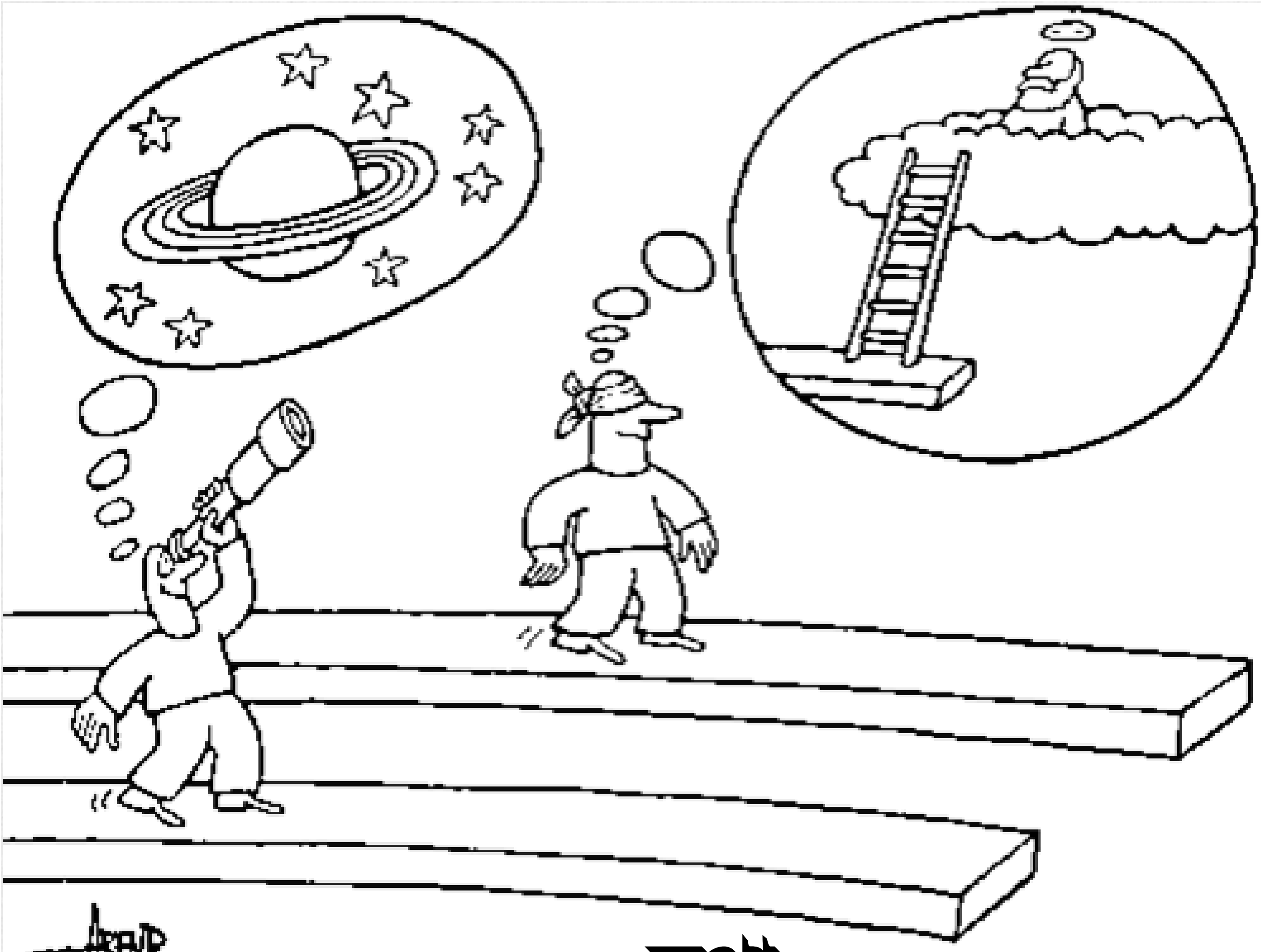
সত্যের মান হানি!

ধর্মের এই নোংরামি দেখে

বেঁধোনা কাপড় চোখে---

বজ্রের মতো কঠিন হয়ে

দাঁড়াও এবার রুখে---



বৃথা

- প্র দী প চ ক্র ব র্তী

দেশের একটা আইন আছে
সেটাই দেবে বিধান,
দেশপ্রেমিক হতে চাইলে
পড়ো সংবিধান।

গাছ কাটলে পস্তাতে হবে
সবুজ হবে ক্ষয়,
সত্যি কথা জোর দিয়ে বলো
দূর করো সব ভয়।

মানুষ আগে? নাকি ধর্ম আগে?
কে বলতে পারে?
যুক্তিবাদের ঔষধেতে
ধর্ম রোগ সারে।

বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে
সবকিছু করো যাচাই,
নইলে পরে কাঁদতে হবে
জীবনটা যাবে বৃথাই।



আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম ‘সবই ব্যাদে আছে’

- মে ঘ না দ সা হা

অনেক পাঠক আমি আমার প্রথম প্রবন্ধে 'সবই ব্যাদে আছে' এইরূপ লেখায় একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে আমি 'বেদের' প্রতি অযথা অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। এই বাক্যটির প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু ব্যক্তিগত ইতিহাস আছে। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বেকার কথা, আমি তখন প্রথম বিলাত হইতে ফিরিয়াছি। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন আমার সামান্য কিছু সুনাম হইয়াছে। ঢাকা শহরনিবাসী (অর্থাৎ আমার স্বদেশবাসী) কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল আমি কি বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি প্রথম জীবনের উৎসাহভরে তাঁহাকে আমার তদানীন্তন গবেষণা

সম্বন্ধে (অর্থাৎ সূর্য ও নক্ষত্রাদির প্রাকৃতিক অবস্থা, যাহা Theory of lonisation of Elements দিয়া সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়) সবিশেষ বর্ণনা দেই।

তিনি দুই-এক মিনিট পর পরই বলিয়া উঠিতে লাগিলেন,

‘এ আর নূতন কি হইল, এ সমস্তই ব্যাদে আছে।’ আমি দুই-একবার মৃদু আপত্তি করিবার পর বলিলাম, মহাশয়, এসব তত্ত্ব বেদের কোন অংশে আছে, অনুগ্রহপূর্বক দেখাইয়া দিবেন কী?'

তিনি বলিলেন, ‘আমি ত কখনও ‘ব্যাদ’ পড়ি নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা নূতন বিজ্ঞানে যাহা করিয়াছ বলিয়া দাবি কর সমস্তই ‘ব্যাদে’ আছে।’ অথচ এই ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

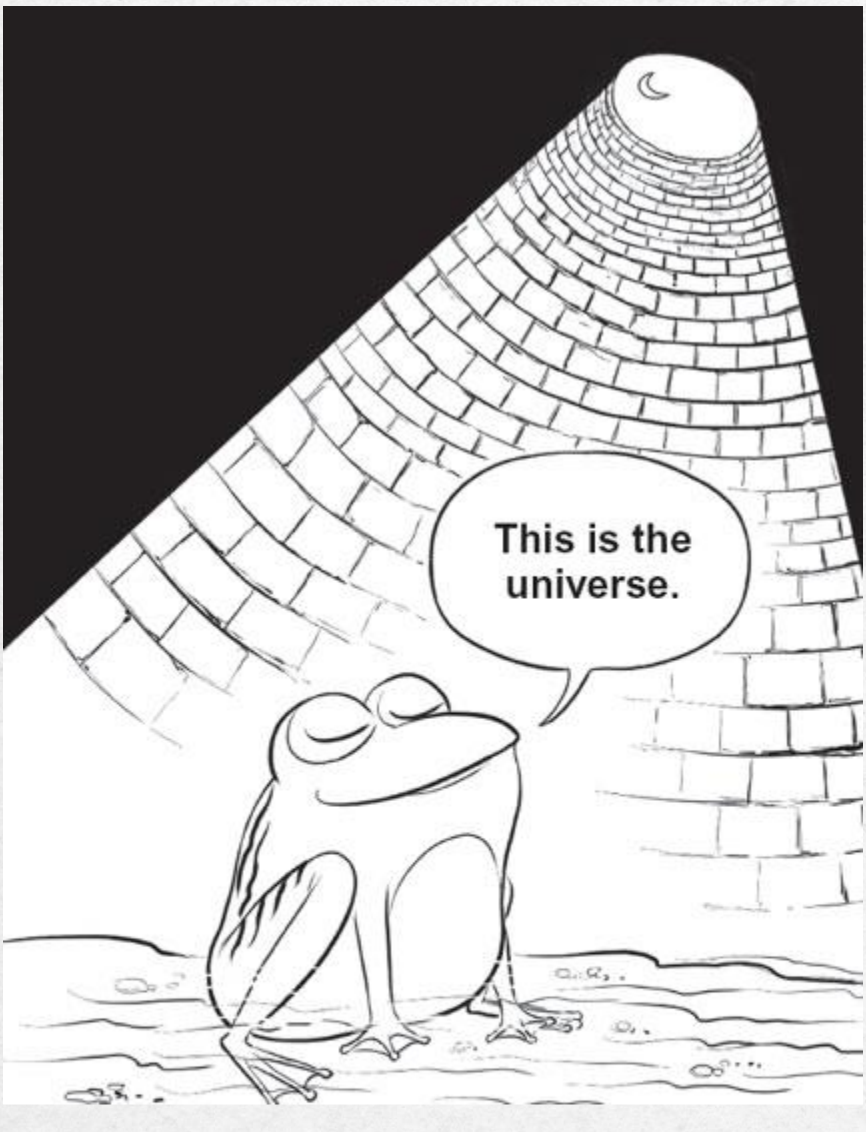
বলা বাহুল্য যে, বিগত কুড়ি বৎসরে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রগ্রহ এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া

আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে।

সকল প্রাচীন সভ্যদেশের পণ্ডিতগণই বিশ্বজগতে পৃথিবীর স্থান, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহাদির গতি, রসায়নবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান বিজ্ঞান গত তিনশত বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সমবেত গবেষণা, বিচারশক্তি ও অধ্যবসায় প্রসূত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, এদেশে অনেকে মনে করেন, ভাস্করাচার্য একাদশ শতাব্দীতে অতি অস্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তিনি নিউটনের সমতুল্য। অর্থাৎ নিউটন আর নূতন কী করিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' শ্রেণির তার্কিকগণ

ভুলিয়া যান যে, ভাস্করাচার্য কোথাও পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহসূর্যের চতুর্দিকে ভাস (elliptical) পথে ভ্রমণ করিতেছে একথা বলেন নাই। তিনি কোথাও প্রমাণ করেন নাই। যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও গতিবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করিলে পৃথিবীর ও অপরাপর গ্রহের ভ্রমণ-কক্ষ নিরূপণ করা যায়। সুতরাং ভাস্করাচার্য বা কোনো হিন্দু, গ্রিক বা আরবি পণ্ডিত

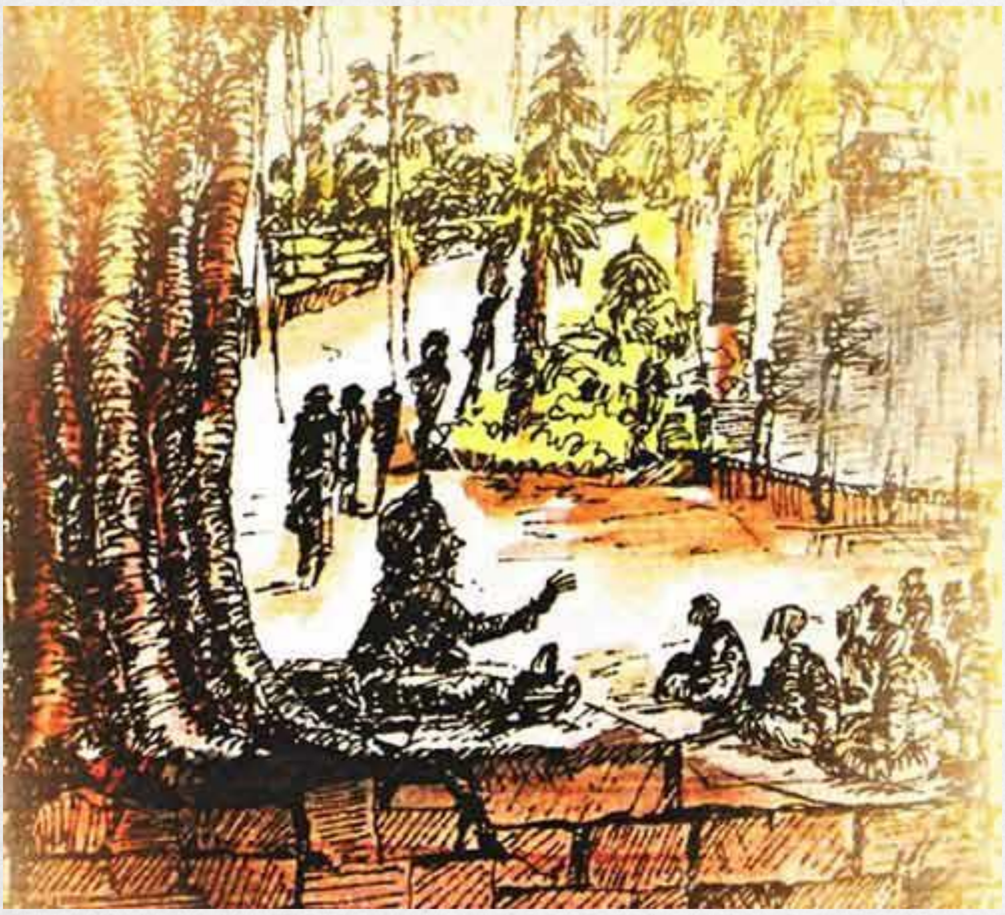
কেপলার-গ্যালিলিও বা নিউটনের বহুপূর্বেই মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বৈ কিছুই নয়। দুঃখের বিষয়, দেশে এইরূপ অপবিজ্ঞান প্রচারকের অভাব নাই, তাঁহারা সত্যের নামে নির্জলা মিথ্যার প্রচার করিতেছেন মাত্র।



এই শ্রেণির লোক যে এখনও বিরল নয় তাহার প্রমাণ সমালোচক অনিলবরণ রায়। তিনিও সবই ব্যাদে আছে এই পর্যায়ভুক্ত, তবে সম্ভবত তিনি 'বেদ' মূলে না হউক, অনুবাদে পড়িয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সবই বেদে আছে এইরূপ অপজ্ঞান আরও জোর গলায় প্রচার করা সম্ভবপর হইয়াছে। আমি 'সবই ব্যাদে আছে' এই উক্তিতে বেদের প্রতি কোনও রূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করি নাই। অনিলবরণ রায় মহাশয়ের মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছি মাত্র।

বেদে কী আছে?

এই ঘটনার সময়, অর্থাৎ আঠারো বৎসর পূর্বে আমার বেদ পড়া ছিল না। বলা বাহুল্য, বেদ বলিতে এস্থানে আমি ঋগ্বেদই বুঝিয়াছি। পরে ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদে 'ঋগ্বেদ-সংহিতা' পড়িয়াছি, কারন মূল বৈদিক সংস্কৃতে পড়ার সাধ্য নাই। সমালোচক অনিলবরণ রায়ও বোধহয় মূল বৈদিক সংস্কৃত' বেদ পড়েন নাই, আর মূলে পড়িলেও তাহা বিশেষ কোনো কাজে আসিবে না, কারন ঋগ্বেদ পাণিনির সময়েই (খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে) দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সায়নাচার্য খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে উহার অর্থ বুঝিতে প্রয়াস পান (সায়নভাষ্য)। কিন্তু প্রধানত য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণই সম্পূর্ণ বেদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন এবং বিবিধ উপায়ে উহার দুর্বোধ্য অংশসমূহের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা . করেন।



কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সত্ত্বেও অধিকাংশ স্থলে অর্থ সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাহার কারন অনেক—একটি প্রধান কারন' এই

যে, বেদের বিভিন্ন অংশ অতি প্রাচীনকালে রচিত হয় এবং যে সময়ে যে দেশে অথবা যে সমস্ত অবস্থার মধ্যে যে শ্রেণির লোক দিয়া রচিত হইয়াছিল, পরবর্তী যুগে লোকে তাহা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানের back ground না থাকিলে প্রকৃত অর্থবোধ হওয়া দুঃসাধ্য এবং পরবর্তীদিগকে কষ্টকল্পনার সাহায্য লইতে হয়। প্রথম জানা দরকার, 'বেদ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল!' বেদে অনেক জ্যোতিষিক ঘটনার উল্লেখ আছে। এই সমস্ত ঘটনার সময়নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নয়। অধ্যাপক জেকোবি, শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, বাল গঙ্গাধর তিলক, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ইত্যাদি দেশি ও বিদেশি পণ্ডিতগণ এই সমস্ত জ্যোতিষিক উল্লেখের বিজ্ঞানসঙ্গত পর্যালোচনা করিয়া 'বেদের উপরোক্ত অংশের সময় নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি বর্তমান লেখকের সমালোচকগণ,

যাঁহারা এককালে গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহারা অনর্থক বাগাড়ম্বর বিস্তার না করিয়া এই সমস্ত প্রবন্ধ পড়িলে নিজেদের মানসিক জড়তা (mental inertia) দূর করিতে পারিবেন।

এই সমস্ত প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বেদোক্ত জ্যোতিষিক ঘটনাগুলির কোনটিকেই খ্রিস্টীয় অঙ্গের চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ফেলা যায় না। অনেকে মনে করেন যে, বাস্তবিক পক্ষে খ্রিঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দ হইতে ৮০০ অব্দের মধ্যে বেদের বিভিন্ন অংশ সংকলিত বা রচিত হইয়াছিল, যেখানে ইহা হইতে প্রাচীনতর ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা 'শ্রুতি মাত্র'। যেমন বর্তমানে এদেশে প্রচলিত পঞ্জিকাতে অশ্বিনী নক্ষত্রকে নক্ষত্রপুঞ্জের আদি ধরা হয়। ইহা বর্তমানে শ্রুতি মাত্র, কারন বাস্তবিক পক্ষে অশ্বিনী নক্ষত্র আদি নক্ষত্র ছিল খ্রিঃ ৫০৫ অব্দে, ১৯৩৯ অব্দে নয়। বর্তমান পঞ্জিকাকারগণ 'মানসিক জড়তা' বশত ১৪৩৪ বৎসর পূর্বের জ্যোতিষিক ঘটনাকে বর্তমানকালীয় বলিয়া প্রচার করিতেছেন। বেদের প্রাচীনতম অংশও অনেক সুবিজ্ঞ লেখকের মতে বাস্তবিক সংকলন কালের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের ঘটনার শ্রুতি মাত্র বহন করিতেছে। যাহা হউক, বেদের প্রাচীনতম অংশকেও খ্রিঃ অব্দের ২৫০০ বৎসর পূর্বে ফেলিতে যুরোপীয় পণ্ডিতগণেরও বিশেষ আপত্তি নাই।

সুতরাং পৌরাণিক সত্যযুগের কথা 'যাহা ১৭,২৮,০০০ বৎসর স্থায়ী এবং

বর্তমান সময়ের ২১,৬৫,০৪০ বৎসর পূর্বে শেষ হইয়াছিল বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ অলীক ও ভ্রান্ত।

খ্রিঃ-পূঃ ২৫০০ অব্দে পৃথিবীতে নানা স্থানে অনেক বড়ো বড়ো সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল। মিশরীয় সভ্যতাকে খ্রিঃ পূঃ ৪২০০ অব্দ পর্যন্ত টানিয়া আনা যায়। আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ২৭০০ অব্দে মিশরে পিরামিড ইত্যাদি নির্মিত হইয়াছিল। খ্রিঃপূঃ ২৬০০ অব্দে ইরাক্ দেশে সুমেরীয় জাতি সভ্যতার উচ্চ শীর্ষে আরূঢ় ছিল। সম্ভবত খ্রিঃপূঃ ১৯০০ অব্দে প্রাচীন সভ্য জগতের কেন্দ্রস্বরূপ বেবিলান নগরী ইরাকের রাজধানিত্ব লাভ করে। নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগে স্থির হইয়াছে যে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে যে প্রাগৈদিক্ ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে খ্রিঃপূঃ ২৫০০ অব্দের দুই-এক শতাব্দীর এদিকে বা ওদিকে টানিয়া আনা যায়।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, 'বৈদিক সভ্যতা' এই সময়ে কোন্ দেশে প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীন মিশরীয়, সুমেরীয় ও প্রাথমিক ভারতীয় সভ্যতার সহিত উহার কোন আদানপ্রদান ছিল কিনা? — বৈদিক সভ্যতার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৫০ পূঃ-খ্রিঃ অদের মিটানীয় রাজাদের উৎকীর্ণ লিপিতে। এই

রাজগণ আধুনিক মোসা (Masul) নগরীর উত্তর পশ্চিম অংশে বাস করিতেন এবং তাঁহারা যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত মিশরীয় ও ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে ধারণা হয় যে নিজেদের সভ্যতাকে উক্ত দুই সভ্যতার সমপর্যায়ভুক্ত মনে করিতেন না। আর একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যদিও প্রাচীন মিটানীয়গণ, ইরানিয়ান অর্থাৎ পারস্য দেশবাসী আর্যগণ ও ভারতীয় বৈদিক আর্যগণ — সকলে প্রায় এক ভাষাভাষি ছিলেন, কিন্তু এতবত কাল পর্যন্ত তাহাদের নিজস্ব কোন লিপি ছিল বলিয়া কোনও অবিসম্বাদিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরঞ্চ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পরবর্তীকালের তুর্কীদের বা মধ্য-এশিয়াবাসীদের মত তাহারা যখন যে-দেশে গিয়াছেন সেই দেশের লিপিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন, পারস্যের এথিমিনীয় বংশীয় রাজগণ, বিশেষত ডেরিয়াস (পরায়াকুস্) ও তাহার পরবর্তী সম্রাটগণ ৫০০ পূঃ-খ্রিঃ আছে তাঁহাদের অনুশাসন পর্বত-গাত্রে উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। এই অনুশাসনের ভাষা প্রায় বৈদিক ভাষা, কিন্তু লিপি প্রাচীন বেবিলোন প্রচলিত কীলক-লিপি এবং সাম্রাজ্যের অংশবিশেষে বিশেষত সিরিয়া দেশ প্রচলিত Aramaic লিপি। ১৪৫০ পূঃ-খ্রিঃ অব্দে মিটানীয়গণ তাহাদের অনুশাসনে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্যাদি বৈদিক দেবতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখানেও বেবিলোন প্রচলিত কীলক (cuneform) লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতীয় আর্যগণ ৫০৩ খ্রিঃ পূঃ অব্দের পূর্বে কী লিপিতে

লিখিতেন এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ২৫০ খ্রিঃ পূঃ অব্দের অশোক রাজার অনুশাসন সমস্তই ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা, হয়ত এই লিপির উৎপত্তি ইহার অনেক পূর্বেই হইয়াছিল। কি করিয়া এই লিপির উৎপত্তি হইল এখনও তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় নাই।

এই সমস্ত ঘটনা হইতে বোধহয় ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না যে, প্রাচীন আর্যগণের কোনো নিজস্ব বিশিষ্ট লিপি ছিল না। তাঁহারা বিজেতা হিসাবে যে দেশে গিয়াছেন, সেই দেশের লিপিই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজস্ব কোনো লিপি (script) থাকিলে তাঁহারা কখনও বিদেশিয় লিপিতে নিজেদের ভাষা উৎকীর্ণ করিতেন না। ইংরেজ ভারতবর্ষে বা চিনে আসিয়া কি নিজেদের লিপি পরিবর্তন করিয়াছে? মধ্যযুগের আর্যগণ অনেক সুসভ্য দেশ নিজেদের অধিকারে আনে, কিন্তু সর্বত্রই অধিবাসীদিগকে আরবিলিপি গ্রহণে বাধা করিয়াছেন। কিন্তু মধ্য এশিয়ার তুর্কী বা হুন বিজেতা হইয়াও চিনে চিন লিপি, পারসো ফারসি লিপি এবং রুশিয়াতে Cyritira লিপি গ্রহণ করিয়াছিল, কারন তাঁহাদের নিজেদের কোন লিপি ছিল না।

সুতরাং আশা করি, সমালোচকগণ স্বীকার করিবেন যে, ঋগ্বেদ সংহিতা খ্রিঃ পূঃ ২৫০০ অব্দ হইতে রচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ইহা সেরূপ সমাজের বা সভ্যতার চিত্র

অঙ্কিত করিয়াছে, সেই সমাজ ও সভ্যতা হইতে উন্নততর সমাজ ও সভ্যতা পৃথিবীর অন্যানা অংশে (ইজিপ্ট, ইরাক) এবং সম্ভবত এই ভারতবর্ষেও বর্তমান ছিল। ঋগ্বেদের মঙ্গনদারির উল্লেখের পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে বর্তমান পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাংশ ও বর্তমান আফগানিস্তানের পূর্বাংশ প্রাচীনতম আর্য্যগণের বাসভূমি ছিল এবং তাহারা প্রায়ই সভ্যতর সিন্ধুনদবাসীদিগকে উৎপীড়ন করিতেন।

ঋগ্বেদ সংহিতার সমসাময়িক সুমেরীয় বা মিশরীর সভ্যতার কোনো উল্লেখ আছে কি? এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ এখনও আবিষ্কার হয় নাই বটে, কিন্তু পরলোকগত লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে দেখান যে, অথর্ববেদের কতকগুলি দুর্বোধ্য শব্দ ও শ্লোক, যাহাদের কোনওরূপ সুস্পষ্ট অর্থ করা কখনও সম্ভবপর হয় নাই, সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইয়া যায়—যদি ধরা যায় যে ঐ সমস্ত শব্দ বেবিলান দেশে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনি হইতে গৃহীত হইয়াছে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে অর্থব বেদ ১৫০০-১৬০০ খ্রিঃপূঃ অব্দে রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলে তিলকের প্রবন্ধ হইতে প্রমাণ হয় যে এই সময়ে ভারত ও বেবিলানের ভিতর যোগাযোগ ছিল। হয়ত ঋগ্বেদের অনেক দুরূহ অংশেরও এইভাবে মীমাংসা হইতে পারে।

ঋগ্বেদে নানা পরিবারস্থ বা গোত্রভুক্ত কবিগণ কর্তৃক সূর্য বা সবিতা, চন্দ্র বা সোম ইত্যাদি প্রাকৃতিক দেবতা এবং ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ইত্যাদি দেবতার উদ্দেশে রচিত স্তোত্রাবলির সমষ্টি মাত্র।

অনেকের মতে মিত্র, বরুণ, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতাও সূর্যেরই প্রতীক মাত্র। কিন্তু গ্রহনক্ষত্রাদি ও প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়া তাহাদের স্তবস্তুতি করা বৈদিক আর্যদের মৌলিক আবিষ্কার বা একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল না। বৈদিক সভ্যতার সমসাময়িক মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতাতে এবং প্রায়শ সর্বত্রই প্রাচীন সভ্যতার স্তরবিশেষে সর্বজাতির মধ্যে এই মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরীয়গণ সূর্য বা 'রা' দেবতাকে প্রধান দেবতা ও সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মনে করিতেন। Suins তারকা বা লুব্ধক নক্ষত্র, যাহা আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠস্থানীয়, তাহাকে তাহারা তাহাদের Isis দেবীর প্রতীক মনে করিতেন। প্রাচীন সুমেরীয়গণের অধিকাংশ দেবতাই ছিল গ্রহনক্ষত্রাদিমূলক। যেমন-

An or Ann আকাশ বা দৌ, Shamash বা Babbar – সূর্য, ন্যায় ও আইনের দেবতা : Sin বা Nannar— চন্দ্র, Istar — সৌন্দর্যের ও প্রেমের দেবী, Venus বা শুক্র

গ্রহকে ইহার প্রতীক মনে করা হইত; Marduk দেবতাদের রাজা, ইনি ছিলেন বৃহস্পতি বা Jupiter গ্রহ; Nabu দেবতাদের লেখক, ইনি আমাদের Saturn বা মঙ্গল গ্রহ : Nergal যুদ্ধের দেবতা, আমাদের Mars বা মঙ্গলগ্রহ। এই সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য সমুদ্র, নদী বা পর্বতাত্মক দেবতাদি সম্বন্ধে প্রাচীন সুমেরীয় কবি বা ঋষিগণ যে সমস্ত স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ বর্তমান সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং British Musium-এর সুমেরীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ গ্যাড় কর্তৃক ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইজিপ্ট দেবতাদের উদ্দেশে রচিত স্তোত্রাবলী ও Egyptian Book of the Dead নামক গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক ব্রেস্টড্ তাঁহার Dawn of Conscience in the World এই গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, খ্রিস্টীয় বাইবেল-এ যে সমস্ত আধ্যাত্মিকতার বাণীকে যিশু খ্রিস্টের মুখনিসৃত বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহার অধিকাংশই ভাব তো নয়, এমন কি, অক্ষরও প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় ও মিশরীয় শাস্ত্রাদি হইতে ধার করা। অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে ৪০০০ পূঃ -খ্রিঃ অব্দ হইতে ৬০০ খ্রিঃ পূঃ অব্দ পর্যন্ত দুইটি সুপ্রাচীন সভ্যজাতি তাহাদের বহু সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে যে সমস্ত আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব (Altruistic Philosophy) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহাই খ্রিস্টীয় ধর্মের আধ্যাত্মিকতা'র ভিত্তি

গঠন করিয়াছে। কিন্তু খ্রিস্টধর্মে এবং আরও অপরাপর ধর্মে গ্রহনক্ষত্র ও নদী-পর্বতাত্মক 'দেবতাসমূহ' নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। পরবর্তী দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি গঠনের জন্য বহুদেবতার উপাসনার কোনো প্রয়োজন নাই।

বেদ ও বেদ-পরবর্তী শাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করিলেও একবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মহোজোদারোর সময় (খ্রিঃপূঃ ২৫০০ অব্দ) এবং অশোকের সময়ের (পূঃ-খ্রিঃ ৩০০ অব্দ) মধ্যবর্তী যুগের ইতিহাস লিখিবার উপাদান এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় ধর্ম ও সত্যতার সমস্ত মূলসূত্র আবিষ্কৃত ও গঠিত হয়। বৈদিক সভ্যতার ও প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার দুইটি ও তিনটি বিভিন্ন ধারার সঙ্গমের ফলেই ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা গঠিত হয়, পরবর্তী যুগের (অর্থাৎ খ্রিঃপূঃ ৩০০ অব্দের পরবর্তীকালের) লিখিত মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ ইত্যাদিতে এই ১২০ বৎসরের ঘটনাবলীর অস্পষ্ট শ্রুতিমাত্র পাওয়া যায়। বৈদিক আর্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসেন পরবর্তীকালে। আনুমানিক বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই) বৈদিক যাগযজ্ঞের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ওঠে। তখন নিশ্চয়ই ঘটা করিয়া যাগযজ্ঞাদি

করিতেন, কিন্তু উপনিষদের 'আধ্যাত্মিকতা' ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাতে বৈদিক দেবতাদি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈনগণ 'বেদকে' সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের ধর্মমত গঠন করেন। কিন্তু যে সমস্ত শাস্ত্র বা দর্শন খাঁটি সনাতনী বলিয়া প্রচলিত, মূলত তাহাদের অনেকাংশই বেদ বিরোধী।

যেমন ধরা যাউক সাংখ্যদর্শন; ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন 'বেদের সংজ্ঞা সাংখ্যে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন।'

বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ হিন্দুশাস্ত্রের সমস্ত মত বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধ প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক পড়িয়া দেখিতে পারেন। এই সমস্ত 'মত' অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বেদ অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত এই মত অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে অর্থাৎ পুরাণাদি রচনার সময় প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীনকালের শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভূত ও অস্পষ্ট মত প্রচলিত আছে, কিন্তু

কোন মতই বেদকে 'অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে নাই।

একটা কথা উঠিতে পারে, বেদের এতটা প্রতিপত্তির কারন কী? যাঁহারা বেদমতবিরোধী তাঁহারাও বেদের দোহাই দেন কেন? একথার উত্তর আর একটি ধর্ম হইতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইতেছে ইসলামধর্ম— যাহা কোরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। হজরত মোহম্মদ 'ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ' শুনিয়া যাহা বলিয়া যাইতেন তাঁহার শিষ্যগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিতেন, এই সংগ্রহই হইল কোরাণ। কিন্তু হজরত মোহম্মদের মৃত্যুর কুড়ি বৎসরের মধ্যেই নানা কারণে বিশাল ইস্লাম জগতের বিভিন্ন অংশে কোরাণের নানারূপ পাঠ ও অনুলিপি প্রচলিত হয়। তখন খলিফা বা ইস্‌লাম জগতের অধিনায়ক ছিলেন ওমান। খলিফা ওমান দেখিলেন যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের কোরাণের প্রচলন হইতে থাকিলে শীঘ্রই ইসলাম ধর্মে অনৈক্য দেখা দিবে, ইস্লাম-জগৎ শতধা বিভক্ত হইবে। ইহার প্রতিকার-কল্পে তিনি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি তৎকালে হজরত মোহম্মদের যে সমস্ত শিষ্য ও কর্মসঙ্গী জীবিত ছিলেন তাহাদিগের একটি বৃহতী সভা আহ্বান করিলেন এবং বিভিন্ন দেশে প্রচলিত কোরাণের রচনাবলি বাস্তবিকই হজরতের মুখনিসৃত কি-না তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বহু দিন এইরূপ পরীক্ষার পর যে সমস্ত রচনা প্রকৃতপক্ষে হজরতের মুখনিসৃত বলিয়া প্রতিপন্ন

হইল, সেই সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকৃত 'কোরাণের' পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করিলেন এবং নিয়ন বাঁধিয়া ছিলেন যে, যদি উবিষ্যতে কোরাণের কোনও অনুলিপিতে কিছুমাত্র ভুল থাকে, তাহা অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। এই কড়া নিয়মের জন্য বিগত চতুর্দশ শতাব্দী ধরিয়া বিশাল ইস্লাম-জগতের কোথাও কোরাণের পাঠ পরিবর্তন সম্ভবপর হয় নাই। ইসলাম-জগতে সর্বত্রই কোরাণ এক।

কিন্তু এইরূপ কড়াকড়ি সত্ত্বেও ইসলামধর্মে নানারূপ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। অধ্যাপক তারাচাঁদের মতে বর্তমানে ইসলামে ৭২টি বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। সকল সম্প্রদায়ই বাহ্যত কোরাণকে অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় (অর্থাৎ হজরত মোহম্মদের মুখনিসৃত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ) বলিয়া স্বীকার করেন।

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস আচার ব্যবহার অনেক সময় আকাশ-পাতাল তফাৎ, গোঁড়া মুসলমানদের মতে 'কোরাণসঙ্গত' নয়।

এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর যুক্তিবাদী মোতাজিল সম্প্রদায় হইতে (যাঁহারা বাস্তবিকপক্ষে সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টট্‌স প্রভৃতি প্রাচীন যুক্তিবাদী গ্রিক দার্শনিকদের মতবাদে বিশ্বাসবান ছিলেন) আগাখানী সম্প্রদায় পর্যন্ত

(যাঁহারা অবতার, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি ভারতবর্ষীয় মতে বিশ্বাসবান) সমস্ত পর্যায়ের ধর্মবিশ্বাসীই আছেন। তাহার কারন, ইস্লামধর্ম অতি অল্পকাল মধ্যেই সিরিয়া, পারস্য, ইরাক্, মধ্য এশিয়া ইত্যাদি নানাদেশে প্রচারিত হয় এবং এই সমস্ত দেশের অধিবাসীগণ ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেও বাস্তবিক স্বদেশপ্রচলিত ধর্মবিশ্বাস একেবারে ছাড়িতে পারে নাই। অনেকস্থলে প্রাচীন গ্রিক ও ভারতীয় ধর্মদর্শনতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও ইসলামীয় ধর্মমতে শ্রদ্ধাবান হইতে পারেন নাই। কিন্তু রাজশক্তি ইসলামধর্মাবলম্বী, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কথা বলিবার মত সাহসও তাহাদের ছিল না। সুতরাং বাহ্যত কোরাণের দোহাই দিয়া, তাঁহারা বাস্তবিক পক্ষে গোঁড়া মুসলমানদের মতে কোরাণবিরুদ্ধ ধর্মমত পোষণ করেন।

'বেদের অভ্রান্ততা'র সম্বন্ধেও এই বক্তব্য চলে। বৈদিক আর্যগণ যখন ২৫০০ খ্রিঃ পূঃ অব্দের কিছু পূর্বে বা পরে উত্তর ভারতের সর্বত্র নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন তাহাদের নেতা পুরোহিত (ঋষি) ও রাজগণ খুব আড়ম্বর করিয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন।

এই যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে তাঁহারা তাহাদের উপাস্য দেবদেবীর উদ্দেশে স্তোত্র

গান করিতেন এবং পশু বলি প্রদান করিতেন।

পাণিনির পূর্বেই এই সমস্ত স্তোত্রাদি সংকলিত, গণিত ও মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হয়। কিন্তু উপনিষদের যুগ হইতেই চিন্তাশীল ঋষিগণ বৈদিক যাগযজ্ঞের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে থাকেন। এদিকে প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতায় যে সমস্ত লোকের ধর্মবিশ্বাস ছিল (সম্ভবত পাশুপতধর্ম বা নারায়ণীয় ধর্ম) তাহারাও ক্রমে অন্য প্রকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চেষ্টা করিতে থাকে। দেশের রাজশক্তি ও পুরোহিতশক্তি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে প্রগাঢ় বিশ্বাসবান সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিজেদের মতবাদ প্রচার করার সাহস প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসীদের ছিল না, সুতরাং তাহারা বেদের অস্পষ্ট সূক্তাদির দোহাই দিয়া নিজেদের ধর্মমতাদির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য প্রাগ্বৈদিক 'শিব পশুপতি' বেদের অমঙ্গলের দেবতা রুদ্রের সহিত এক হইয়া গেলেন এবং 'বেদের' সৌরদেবতা বিষ্ণুর সহিত নারায়ণীয় ধর্মের নারায়ণের একত্ব সম্পাদনের প্রয়াস হইল। পাশুপত ও নারায়ণীয় মতাবলম্বীগণ এইরূপে বেদের দোহাই দিয়া অবৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বা ধর্মবিশ্বাসকে 'জাতে' উঠাইয়া লইলেন, যদিও অনেকস্থলে গোঁড়া বেদবিশ্বাসীগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; কিন্তু জৈন বা বৌদ্ধেরা ঐ পথে মোটেই গেলেন না, তাঁহারা সরাসরিভাবে বেদের অভ্রান্ততা

অস্বীকার করিলেন এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডকে নিরর্থক বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

বর্তমান লেখক বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হিন্দুর বেদ ও অপরাপর ধর্মের মূলতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে অবজ্ঞা বা অবহেলার কোনো কথা উঠিতে পারে না। তাহার বিশ্বাস যে,

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহ যে সমস্ত জাগতিক তথ্য (world-phenomena), ঐতিহাসিক জ্ঞান ও মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের উপর বর্তমান যুগের উপযোগী 'আধ্যাত্মিকতা' প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

কিরূপে 'বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির ভিত্তিতে নবযুগের উপযোগী 'আধ্যাত্মিকতা'র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, প্রবন্ধান্তরে তাহার সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

—

চেতনার অন্বেষণে

মাসে একটি লেখা

মুক্তচিন্তার ওপর লেখালেখি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে দেখে পত্রিকাটি শুরু করেছিলাম।

আপনারা যারা মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ, নাস্তিকতার চর্চা করেন যেমন পারবেন, যতটুকু পারবেন লিখুন। ফেসবুক, ব্লগ ইত্যাদি মিডিয়ায় লেখা প্রকাশ করার পাশাপাশি লেখাটি পাঠান।

পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য যুক্তিবাদীদের লেখালেখিতে উৎসাহিত করা, এবং মুক্তচিন্তকদের চিন্তাধারা সমাজে তুলে ধরা।

প্রচলিত অর্থে ম্যাগাজিনের জন্য লেখা বলতে গুরুগম্ভীর, বড়, সাধারণ লেখার থেকে একটু আলাদা, কিংবা সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ এরকম বুঝি, কিন্তু আমরা যে ধরনের লেখা চাই তা এরকম হতেই হবে এমন মোটেও নয়। কোন সাম্প্রতিক ঘটনা বা কোন বিষয়ে আপনার চিন্তা-ভাবনা কী সে সম্পর্কে ৫-১০ লাইন লিখলেও পাঠানো যায়। আমরা চাই আপনার লেখনী চলতে থাকুক। লেখায় নিজের পরিচয় গোপণ রাখতে চাইলেও অসুবিধা নেই, আপনার লেখা প্রকাশ করব। যা দুই বাংলার অগনিত মানুষের কাছে আমাদের ভাবনা ছড়িয়ে পড়বে এবং মুক্তচিন্তকদের আরও সংঘবদ্ধ করতে উৎসাহিত করবে।

এমন নয় যে আপনার লেখাটি কোথাও প্রকাশ করেছেন বলে দেওয়া যাবে না, তা একেবারেই নয়। ক্রমশ অসহনীয় রাজনৈতিক দিনগুলিতে যুক্তিবাদীরা কোণঠাসা হচ্ছে। তাদের নিজেদের জন্য হলেও কলম তুলে নিতে হবে এটি নির্মম সত্য। কোন প্রকার প্রশ্ন এবং লেখা পাঠানোর ঠিকানা নীচে দেওয়া রয়েছে। ধন্যবাদ।

অক্টোবর সংখ্যা সংগ্রহ করুন

পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হোন (বিনিময়মূল্য ছাড়াই)

পত্রিকার গ্রাহক হতে ফর্ম পূরণ করুন- Cilck Here | Scan QR

যোগাযোগ

Email: yuktibadira@gmail.com

